# আনাকাহন

# আনাকাহন

## জাহেদ রহমান

র‍্যামন পাবলিশার



**আনাকাহন**
জাহেদ রহমান
প্রথম প্রকাশ: অমর একুশে বইমেলা ২০২৪
প্রচ্ছদ: ইমরান হোসেন পিপলু


ISBN: 978-984-98702-5-8

---

র‍্যামন পাবলিশার-এর পক্ষে ২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে
সৈয়দ রহমত উল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন: ৯৫১৫২২৮, ০১৯১৭৯৬২৩০৩
ramonpublishers@gmail.com
www.ramonpublisher.com

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
www.porua.com.bd

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ
মেঘদূত
বেজমেন্ট রুম # ৫৯-৬০
কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা সরণী, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
meghdut.kalidas@gmail.com

মূল্য: ৫০০.০০ টাকা US$ 15.00

উৎসর্গ—

আমার বই পড়বার আর লেখালিখির অনুপ্রেরণা আমার মা।

## লেখকের কথা

'আনাকাহন' উপন্যাসটি একজন স্বপ্নান্বেষী নারী রিয়ানার জীবনের গল্প। পারিবারিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে রিয়ানার বেড়ে উঠা। নাচ, গান, অভিনয় শৈশব থেকেই তাঁর শোণিত ধারায় বহমান। কৈশোরে 'রক্ত করবী' নাটকের মঞ্চায়ন দর্শক সারিতে বসে উপভোগ করেছে। সেই থেকে 'রক্ত করবী'র রঞ্জন তাঁর আরাধ্য স্বপ্নপুরুষ। রিয়ানা মনের মাঝে প্রতিনিয়ত ওর রঞ্জনের প্রতিচ্ছবি আঁকছে।

কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে শরীফের সাথে রিয়ানার পরিচয় এবং খুব দ্রুতই ওরা গাঁটছড়া বাঁধে। দাম্পত্যজীবনের প্রথম দিন থেকেই রিয়ানা আবিষ্কার করে যে শরীফ তাঁর ব্যাপারে ভীষণ উদাসীন এবং অনাগ্রহী। রিয়ানার মনে প্রশ্ন জেগে থাকে, শরীফ কি তাঁকে বিয়ে করে অনুতপ্ত? শরীফ কি তাঁর ধর্ম নিয়ে বিব্রত? দু'টি হৃদয়ের মেলবন্ধন আর সৃষ্টি হয় না।

রিয়ানা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের থিয়েটার এবং চলচ্চিত্র জগতে পদার্পণ করে। দুর্বল অভিনয়শৈলীর কারণে এই জগতদ্বয়ে তার পদচারণা অনুল্লেখ্য। বরং কিছু কিছু সময় তাঁকে অপব্যবহৃত হতে হয়েছে। একদিকে তাঁর দাম্পত্য জীবনের নড়বড়ে গাঁথুনি, অন্যদিকে কর্ম জগতে দুর্বল পদচারণা তাঁকে মানসিকভাবে অস্থির করে তুলে। মানসিক দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত এবং প্রকট হয়েছে তাঁর সিদ্ধান্তহীনতায়। আরাধ্য 'রঞ্জনে'র খোঁজে বারবার সে সম্পর্ক গড়ে তুলে। সেই সম্পর্কগুলো তাঁকে সামাজিকভাবে বিব্রত করেছে, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে শারিরিকভাবে হেয় করেছে।

কেন যেন ওই ছবি আঁকা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। সারাটি জীবন ওই অসম্পূর্ণতা রিয়ানাকে তাড়া করে।

ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ — জাহেদ রহমান
ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ — ঢাকা

১

মাঝে মাঝে হাসান তার বারান্দায় বসে; বারান্দাটি এতো প্রশস্ত নয়, পঞ্চভূজাকার। প্রশস্ত বাহুগুলো উত্তর-পূর্ব, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে খোলা। কলামে পিঠ রেখে সে একটি প্লাস্টিকের টুলে বসে হারুকি মুরাকামি'র 'উইন্ড পিনবল' বইটি পড়তে শুরু করে। চড়ুই পাখির আনন্দময় চিৎকার ছাড়া চারদিকে সুনসান নীরবতা। গত কয়েকদিনে তাদের সংখ্যা বেড়েছে। পিছনের প্রধান সড়ক দিয়ে মাঝে মাঝে যাওয়া গাড়ির আওয়াজ তাকে 'মুরাকামি'কে রস আস্বাদন করা থেকে বঞ্চিত করে না।

নীরবতা ভেঙে গেল যখন কাকটি তার পাশ দিয়ে কা কা ডাকতে ডাকতে উত্তরদিকে উড়ে গেলো এবং দুই ব্লক দূরে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের পিছনে পূর্ব দিকে ফিরে গেলো। হাসান এটিকে একটি শুভ চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সে মাঝে মাঝে লক্ষণে বিশ্বাস করে। হাসান বারান্দার গ্রিলের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত শক্ত করে ঐশ্বরিকভাবে আঁকা অফ-হোয়াইট স্কোয়ার বারগুলি চেপে ধরেছে। আঙুলের মাথাগুলো সাদা হয়ে গেছে, সে খেয়াল করে না। উত্তর দিগন্তের অনেক দূরে নির্মীয়মাণ জনপদের বিশাল সাদা বালুকাময় মাঠ জুড়ে হাসানের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

মাঠটি পিচ ঢালা পাকা রাস্তা দিয়ে বর্গাকার এবং আয়তক্ষেত্রগুলিতে সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত। একটি টিনের ছাদের ঘর গর্বের সাথে মাঝখানে দাঁড়িয়ে অশ্লীলভাবে তার উপস্থিতি ঘোষণা করছে। হাসান ভেবেছিল, শুধু সাদা বালুকাময় মাঠ থাকলে ভালো হতো। তার চোখ গাছের সারির উপরে, বিল্ডিংগুলির বিশৃঙ্খলতার আরো অনেক উপরে মেঘের পাতলা স্তরটিতে স্থির ছিল এবং অধোগামি বিমানের কাছাকাছি আসার শব্দের জন্য অপেক্ষা করছিল।

তার ব্যবসায়িক অংশীদার সগীর বিকেলে ফোন করে জিজ্ঞেস করে, 'আজ সন্ধ্যায় তুমি কি ফ্রি?' 'হ্যাঁ,' হাসান উত্তর দিলো। 'ঠিক আছে, সাতটায় ক্লাবে থেকো,' মুঠোফোনটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।



সাতটার দিকে হাসান ক্লাবে পৌঁছালো। কনসিয়ার্স জানালো যে সগীর সাহেব রেস্তোঁরায় তার জন্য অপেক্ষা করছে এবং তাকে লিফটের দিকে নিয়ে যায়। হাসান কনসিয়ার্সকে সরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে গেলো। ও অল্প উচ্চতায় সিঁড়ি বেয়ে উঠা পছন্দ করে। রেস্তোরাঁয় ঢোকার সময় মাঝখান থেকে সগীর তার দিকে হাত নাড়লেন।

ঘরটি হালকা আলোকিত। দেয়ালগুলি বুক পর্যন্ত পর্যন্ত লাল রঙ করা। এমন করে পৃথিবীতে কেউ দেয়ালকে লাল রঙে আঁকছে! হাসান বিস্মিত। 'বসো, আমি তোমাকে মাইকেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই,' সগীর বললো। হাসান তার চোখ টেবিলের দিকে ফিরিয়ে আনলো, তার পাশে একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক বসে ছিল, যার চুল নিখুঁতভাবে কাটা ছিল, সম্ভবত জেল দেওয়া; ঠোঁট যেখানে মিলিত হয় সেই বিন্দু পর্যন্ত পাতলা গোঁফের রেখা। মাইকেল ইংল্যান্ড থেকে এসেছে, সরকারী সংস্থাগুলির সরবরাহকারী। তাদের টুকটাক আলাপ চলতে থাকে। হাসান চারদিকে তাকাতে থাকে। রুমটি খুব বেশি ভরে নি তবুও সে ধনী লোকদের প্রবল উপস্থিতি, বাতাসে পারফিউমের সুগন্ধ ও রেড ওয়াইন গ্লাস দিয়ে টোস্টিংয়ের শব্দ অনুভব করছিল। হাসান অস্থির বোধ করছিল এবং বাইরে যেতে চেয়েছিল। সগীর হাসানের গায়ে হাত রেখে বললো, 'দাঁড়াও, ভাই।' হাসান অপেক্ষা করতে থাকে।

মঁ ব্লাঁ বা চ্যানেল কোকো থেকে ফেম ইনডিভিজুয়েলের সাথে মিশ্রিত একটি তাজা বাতাস তার নাকের মধ্যে প্রবেশ করে। পারফিউম চেনার ক্ষেত্রে সে দুর্বল। হাসান ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, তার বোঝার পরিধি কেবল ভাল এবং খারাপ। 'হ্যালো! আমি টুনটুনি,' তাজা বাতাস তাকে বলে। হাসানের চোখ তার সুন্দর চোখের দিকে স্থির ছিল, গভীর কালো, চমৎকার বাঁকানো। হাসান নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছিল, সে টুনটুনির প্রসারিত হাত দেখতে পায়নি। টুনটুনির পরনে একটি লাল টি-শার্ট, কালো টাইটস্ এবং লাল হাই হিল জুতা। কালো কোঁকড়ানো চুল একটি গোলাকার মুখের উপরে বসে, ঘাড়ের উপর পর্যন্ত ছোট করে

ছাঁটা, পাতলা চোখের ভ্রূ, ভারসাম্যপূর্ণ নাক এবং প্রশস্ত ঠোঁট তাকে ভাবতে বাধ্য করেছিল 'আমি তাকে কোথাও দেখেছি।' সগীর তাকে লজ্জা থেকে উদ্ধার করেন। 'আমি তোমাকে তার সম্পর্কে একদিন বলেছিলাম। সে তোমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিল।'

'আমি দুঃখিত,' হাসান বিচলিত হয়ে বললো।

'ঠিক আছে। আপনি কি আমাকে বসার প্রস্তাব দেবেন না?' টুনটুনি বললো।

'হ্যাঁ, অবশ্যই, দয়া করে বসুন,' হাসান বললো এবং তার হাতটি ধরে রাখলো, চমৎকারভাবে নরম কিন্তু উষ্ণ। আঙুলগুলি বাঁশি বা সেতার শিল্পীদের মতো লম্বা এবং সরু আকৃতির ছিল।

ডিনার জুড়ে তারা অন্য দুজনের উপস্থিতি উপেক্ষা করে বেশিরভাগ সময় একে অপরের সাথে কথা বলেছিল। তিনি লাল পছন্দ করতেন। হয়তো ক্লাব তার জন্য দেয়াল এঁকেছে, হাসান বিস্মিত। যখন সে সগীর বা মাইকেলের সাথে কথা বলছিল, হাসান অনুভব করেছে যে তিনি এখনও তার দিকে নজর রাখছেন, পরিমাপ করছেন। তিনি কৌতূহলী ছিলেন কিন্তু এটি নিজের কাছে রেখেছিলেন। রাতের খাবার শেষে রওনা হওয়ার সময় তারা মোবাইল নম্বর বিনিময় করেন। গাড়ি চালানোর জন্য তার শোফারের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমি আপনাকে ফোন করবো।' তিনি করেছিলেন।

ভালোবাসা, হাসি, বেদনা, সফলতা ও ব্যর্থতায় কেটে গেল বছরের পর বছর। তারপর তিনি বসন্তের একটি সুন্দর সকালে বাতাসে উবে গেলেন। তিনি স্বেচ্ছায় এসেছিলেন এবং স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছেন।

হাসান জানে বিমান তাকে ফিরিয়ে আনবে না। তিনি তার পছন্দ মতো কোথাও আছেন। তবুও তিনি অপেক্ষা করছেন।

'দু দিক হতে দুজনে যেন বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে ব্যকুলগতি ব্যগ্রপ্রাণে,



সহসা এসে মিশিয়া গেল নিশীথ পারাবারে॥
থামিয়া গেল অধীর স্রোত, থামিল কলতান,
মৌন এক মিলনরাশি তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি—
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে দোঁহার অবসান।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

রান্না ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আঁতকে উঠে সুতপা চিৎকার করে মেয়েকে ডাকলেন, 'আনা... আনা... আনা।' রিয়ানা দুই পায়ের বেড়ি দিয়ে পেয়ারা গাছে ঝুলছে। বাম হাতে পেয়ারা, মাঝে মাঝে দুলে দুলে ডান হাতে মাটি ছোঁয়ার চেষ্টা করছে।

'নাম গাছ থেকে, পড়ে যাবি তো।'

'না, নামবো না। তোমাকে কতবার বলেছি যে আমার নাম রিয়ানা। এক আনা না, দুই আনা না, রিয়ানা। হয় রিয়ানা বলো, আর না হলে ম্যাডাম বলো।'

'আচ্ছা তোকে সব বলবো, এখন নাম না মা গাছ থেকে। সাত সকালে উঠে গাছে চড়ে বসে আছিস, স্কুলে যেতে হবে না?'

গাছ থেকে নেমে জানালা দিয়ে মায়ের কাছে হাত বাড়ালো রিয়ানা, 'যাবো, আগে লবণ আর একটু মরিচ দাও পেয়ারাটা খাই।'

'যা, স্কুলের জন্য রেডি হয়ে আয়, আমি নাস্তা দিচ্ছি।'

রিয়ানা রান্নাঘরের পাশের সরু করিডোর দিয়ে ঘরে ঢুকলো। ওদের বাসাটি চন্দ্রঘোনা কাগজকলের একতলা সরকারি কোয়ার্টার, বিচ্ছিরি হলুদ রঙের, নাম দিয়েছে সুরমা-১। যতবারই রিয়ানা নাম দেখে ততবারই ভ্রূ কুঁচকায়, কর্ণফুলীর পাশে বাড়ি, নাম হবে কর্ণফুলী, তা না দিয়ে নাম দিয়েছে সুরমা, অসভ্য। বাসাটিতে তিনটি রুম। একটি ওদের দুইবোনের, আরেকটিতে বাবা-মা থাকেন। ওর দুই ভাইয়ের ড্রয়িং রুমে খাট পাতা আছে। এখন ছোট ভাই লিমন থাকে, সবার বড় ভাই লিখন চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে পড়ে।

ডাইনিং রুমের পাশের বাথরুমে ঢুকে হাতমুখ ধুয়ে রুমে এলো। সোহানা এর মধ্যে রেডি হয়ে গেছে। রিয়ানা সালওয়ার পড়ে সোহানাকে বলল, 'আপু গিঁট দাওতো।'



'বড়ো হয়ে যাচ্ছিস, এখনো পাজামার গিঁট দিতে পারিস না। আর খালি কামিজ পরবি না, সেমিজ পরে নিবি।'

রিয়ানা লজ্জায় লাল হয়ে বলে, 'আপু...।' রিয়ানা ক্লাস ফাইভে পড়ে, এগারোতে পা দিয়েছে, একটু বাড়ন্ত শরীর, ওর ক্লাসে সবার চেয়ে লম্বা।

সোহানা সস্নেহে রিয়ানা'র এলোমেলো ঝাঁকড়া চুল বড় কাকই দিয়ে গুছিয়ে, নীল কামিজের উপর সাদা ওড়না চাপিয়ে সাদা বেল্ট দিয়ে কোমরের কাছে বেঁধে দিয়ে বললো, 'যা বই-খাতা নিয়ে টেবিলে আয়, নাস্তা খাবি। তুই তোকে ম্যাডাম ডাকতে বললি কেন?'

'আমার ক্লাস টিচার বলেছে আমি নাকি দেখতে ম্যাডামদের মতো।'

'পাগলি, আচ্ছা আয়, আর পাকামি করতে হবে না।' দুই বোনে নাস্তা খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর, স্কুলের সময় চলে গেলো।' সুতপা তাড়া দিলেন।

বাসা থেকে স্কুল আট-দশ মিনিটের পথ। ইট বিছানো সরু পথ সোজা গিয়ে পাকা রাস্তায় মিলেছে। এরপর দু'মিনিটে স্কুল গেট। রিয়ানার এই ইট বিছানো পথটি ভালো লাগে। দু'পাশে ছোটো ছোটো টিলা, মাঝে মাঝে একতালা হলুদ রঙের বাড়ি। রাস্তার ধার দিয়ে বুনো ঝোপ, লালচে বাদামি মাটিকে ঢেকে লজ্জাবতীতে ছেয়ে আছে। ঝোপের উপরে বড়ো বড়ো গাছ। সবগুলোর নাম ও জানে না। বাবা ওকে কিছু গাছের নাম বলেছে, মনে রাখতে পারেনি। ছাতিম গাছটিকে মনে রেখেছে, ওর প্রিয় বান্ধবী স্মৃতি বলেছে, 'ছাতিম গাছে ভূত থাকে।' পাতাগুলো পুরুষ্টু, একটু লম্বাটে, ছোটো ছোটো সাদা ফুলগুলো একই বোটায় এক থোকা ফুটে উঠে। ফুল আর ভূত, দুটোই রিয়ানার খুব প্রিয়। তেতুয়া কড়ই পরের টিলাতে। এর পাতাগুলো তেঁতুলের পাতার মতো। বাবা এভাবেই চিনিয়েছে। ওর সাথী কয়েকটি শিমুল গাছ। শীত চলে গেলে ওর গায়ে যেন আগুন ধরে যায়। আগুন-শিমুলে শিউরে উঠে রিয়ানা। শিমুলের লাল রঙ রিয়ানার ভালোবাসা।

শিমুল পেরোলেই ক'টি জারুলের টিলা, এর পরেই পাকা রাস্তা। ডানে মোড় নিয়ে দুই বোন বুকে বই জড়িয়ে স্কুল গেটে পৌঁছে গেলো। নীল লোহার গেট, এক পাশে ছোটো গেট খোলা, মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। গেটের উপরে সাদা আর গোলাপি বাগান-বিলাসের ঝাড়। মাথা নিচু করে দুই বোন ঢুকে গেলো, গেটের দারোয়ান দাদু বললেন, 'আজকেও দেরী, তাড়াতাড়ি যাও, অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে গেছে।'



৩

রিয়ানা ক্লাসরুমের জানালা দিয়ে আনমনা বাইরে তাকিয়ে দেখছে, পিছনের টিলাটি অন্যগুলো থেকে একটু আলাদা। মাঝে ইটের স্তূপ, জংলি লতা-পাতা দিয়ে ঢেকে আছে। যেতে ইচ্ছে করে আবার ভয়ও লাগে। সাপ, জোঁক যদি থাকে। স্মৃতিকে পটাতে হবে, ও একটু বেশি ভীতু।

স্মৃতির কনুইয়ের গুতোতে রিয়ানা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি?'

'ম্যাডাম ডাকে,' স্মৃতি মাথা নীচু রেখে ফিসফিস করে বলে।

এই মেয়ে বাইরে তাকিয়ে আছো কেন? ক্লাসে মনোযোগ নেই? 'সংকল্প' কবিতার শেষ চার লাইন আবৃত্তি করো।

বাংলা ম্যাডামের আঙুলের ইশারায় রিয়ানা বই হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বই রাখো, মুখস্থ বলো।
'পাতাল ফেরে নামব নিচে
উঠবো আবার আকাশ ফুঁরে
বিশ্ব জগত দেখব আমি
আপন হাতের মুঠোয় পুরে'—মাথা উঁচু করে পরিষ্কার কণ্ঠে আবৃত্তি করে রিয়ানা ।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠে। 'যা, আজ বেঁচে গেলি। কাল এই চার লাইন দশবার করে লিখে আনবি।'

'জ্বী, ম্যাডাম,' বই গুছাতে গুছাতে বলে রিয়ানা ।

স্মৃতিকে সাথে নিয়ে একদৌড়ে হাসপাতালের সামনে এলো, হাঁপাতে হাঁপাতে জানালা দিয়ে বাবার সামনে হাত বাড়িয়ে রিয়ানা বললো, 'বাবা, সি ভিট দাও।'

সাত্যকি রঞ্জন গোমেজ চন্দ্রঘোনা কাগজ কল হাসপাতালের কম্পাউন্ডার। হাসপাতালটি ছোট, একটা দুই বেডের আইসোলেশন ওয়ার্ড, চারটি সাধারণ রোগীর বেড, ডাক্তার সাহেবের চেম্বার, আর ঔষধ স্টোর। সাত্যকি স্টোরেই বসেন। জ্বর, সর্দিকাশি ছাড়া আর কোনও রোগের ঔষধ নেই। ডাক্তার সাহেব সপ্তাহে দু'দিন চট্টগ্রাম থেকে আসেন। বাকি দিনগুলো সাত্যকিই রোগী দেখেন, জরুরি হলে শহরে পাঠিয়ে দেন। হারুন ওর সহকারী হিসাবে কাজ করে, আর একজন আয়া আছে।

'মা, শুন দশদিন পরে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান আছে। তুই আর স্মৃতি নাচের অনুশীলন কর,' দুটো সি ভিট বাড়িয়ে দিয়ে সাত্যকি বলেন।

'বাবা, তবলচি লাগবে,' রিয়ানা জানায়।

"হারুন যাবে বিকেলে। আর মা-কে বলিস আমরা 'রক্তকরবী' করবো।"

'সত্যি, বাবা। যা ভাল লাগবে, তোমাদের মঞ্চে এত মানায়,' খুশীতে টসবগ করে রিয়ানা ।

'হইছে, ডেঁপোমী করতে হবে না এখন, বাসায় যা,' মৃদু ভর্ৎসনা করেন সাত্যকি।

আজই ম্যানেজার সাহেব জানালেন যে পহেলা বৈশাখের সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। ওরা দুজনেই নাটকে অভিনয় করতে ভালোবাসেন। চট্টগ্রামের নাট্যাঙ্গনে তাঁর যাতায়াত আছে। সুযোগ পেলেই মঞ্চে নেমে যান। মঞ্চের আলো-আঁধারির মধ্যে যখন সংলাপ ছুঁড়েন তখন বাকি আর সব ভুলে জান। এই ছোট মেয়েটাও একই হয়েছে। বই মোটেও পছন্দ নয় তার। নাচ, গান, আর অভিনয়ের সুযোগ এলে নাওয়া-খাওয়া বাদ।

স্মৃতি বিকেলে বাসায় আসিস, দেরী করবি না কিন্তু। বলেই রিয়ানা দ্রুত বাসার দিকে হাঁটা দিলো। মন নাচছে, কত পরিকল্পনা মাথায় এসে গেলো, কি পরবে, কিভাবে সাজবে ভাবতে ভাবতে বাসার সামনে।



সুতপা স্নান সেরে শাড়ি, পেটিকোট, গামছা বাসার সামনে তারে মেলে দিচ্ছেন। রিয়ানা ওই অবস্থাতেই মাকে জড়িয়ে ধরে। 'মা, বাবা বলেছেন বৈশাখে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান আছে,' মায়ের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে রিয়ানা বলে।

'ছাড় আমাকে, কেবলই স্নান সেরে এলাম, ঘরে যা। কাপড় ছাড়, স্নান সেরে খেতে আয়। সোহানা এখনি আসবে। খেতে খেতে শুনবো,' মেয়েকে জোড় করে ছাড়িয়ে দিয়ে সুতপা খাবার টেবিল গুছাতে গেলেন।

বিকালে স্মৃতি বাসায় আসতেই রিয়ানা ওকে বললো, 'চল আগে একটু ঘুরে আসি।'

'কেন নাচ প্রাকটিস করবি না?'

'করবো, সন্ধ্যার পরে। এখন চল যাই, এত জিজ্ঞেস করিস কেন?'

টিলার কাছে এসে দুজনে সরু পায়ে চলার পথ দিয়ে উপরে উঠতে থাকলো, লতানো বুনো ঝোপ পায়ে জড়িয়ে যায়। অযত্নে বেড়ে উঠা ভাঁট আর আকন্দের ঝোপ, আকন্দের সাদা পাপড়ি বেগুনি রঙের ছোঁয়া, মাঝে বেগুনি পরাগধানিগুলো অসম্ভব সুন্দর। ভাঁটফুলগুলো আরও সুন্দর, ধবধবে সাদা পাপড়ি, মাঝে সরু চার পাঁচটি লম্বা পরাগদণ্ড। রিয়ানা দুটি ভাঁটফুল ছিঁড়ে কানে গুজে নিলো।

'এই দেখ দেখ এটা আরো সুন্দর,' স্মৃতি উপরের দিকে দেখালো। হলুদ ফুলে ছেয়ে আছে ঝোপটি। পাপড়িগুলো পাতলা, হাল্কা বাদামী রেখা, সবুজ পাতাগুলো ঢেকে গেছে হলুদের বন্যায়। রঙের বন্যায় ভেসে দুজনে টিলার চূড়ায় ভগ্ন ইটের স্তূপের কাছে পৌঁছালো।

'না রে, আর কাছে যাবো না, যদি সাপ থাকে,' স্মৃতি রিয়ানার হাত চেপে ধরলো।

'আচ্ছা, যাব না বাবা,' আশ্বস্ত করে রিয়ানা গাছের ডাল ভেঙে ইটের স্তূপের সামনে থেকে বুনো লতা সরালো। দুই তিন ফুট উঁচু ভিত, ইটগুলোর ধার ক্ষয়ে গেছে, উপরের অংশটি চারদিক থেকে সরু হয়ে

চূড়ায় মিলেছে। চূড়াতে কিছু একটা ছিল, ভেঙে গেছে। চারদিকেই খিলান দরজার মতো কাটা, ভেতরটি ফাঁকা। উপরের অংশটিতে নকশা আঁকা, বিবর্ণ। ইটগুলোতে শ্যাওলা ধরেছে। এটা কি বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ভাবলো রিয়ানা।

আরো উপরে উঠতেই নীল আকাশ যেন হঠাৎ করেই সামনে এলো। আকাশের বুক চিড়ে সাদা রেখা ধীরে ধীরে বাড়ছে, ওদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। একটু দূরেই কর্ণফুলী নদী, এখনো শান্ত। ওপারে উঁচু-নিচু সবুজ পাহাড়ের সারি। সকালে বিছানার চাদর যেমন এলোমেলো থাকে তেমনি ওপারটি এলোমেলো। অনেক দূরে যেখানে আকাশ পাহাড়ে মিশে গেছে সেই খানটিতে কালচে মেঘের ছায়া।

'চল্, এখন যাই, সন্ধ্যা হয়ে আসছে,' স্মৃতি তাড়া দিলো।

বাসায় ফিরতেই দেখে সামনে হারুন ভাই দাঁড়িয়ে আছেন। রিয়ানা খানিক লজ্জা পায়, ও লম্বা ফ্রক পরেছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত।

'আপনি ভিতরে বসেন, আমরা রেডি হয়ে আসি,' বলেই দ্রুত পায়ে স্মৃতিকে নিয়ে নিজের ঘরে গেলো। হাতমুখ ধুয়ে সালোয়ার পরলো, পায়ে মল পরলো, ব্যান্ড দিয়ে অবাধ্য চুলগুলো শাসনের চেষ্টা করে ড্রয়িং রুমে এলো।

মা আর সোহানা আপু দুজনেই খাটের উপরে বসে আছে। মায়ের সামনে হারমোনিয়াম, হারুন ভাই মেঝেতে বসে তবলাতে পাউডার মাখাচ্ছেন, ডোরি আঁটসাঁট করার চেষ্টা করছেন আর মাঝে মাঝে ময়দানে আঙ্গুল চাপড়ে আওয়াজ বাজিয়ে দেখছে।

'তোরা রেডি?' বাবা জানতে চাইলেন।

ওরা দুজনে মলের আওয়াজ তুলে মাঝে গিয়ে দাঁড়ালো।

'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।'



দু'জন শৈশব না-পেরোনো, কৈশোর না-ছোঁয়া কিশোরী তবলার তালে হারমোনিয়ামের সুরে আপনমনে ফুটিয়ে তুলছে ভ্রমর, চুর, ত্রিশূল, অর্ধচন্দ্র। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হারুন তবলায় ত্রিতালের বোল তুলে,

ধা ধিন ধিন ধা
ধা ধিন ধিন ধা
ধা তিন তিন তা
তা ধিন ধিন ধা।

## ৪

চন্দ্রঘোনা খ্রিস্টান মিশন হাসপাতালের একপাশে ছোট্ট একটি গির্জা। চারদিকে ইটের দেয়াল। লম্বা দিকগুলোতে তিনটি করে জানালা। ছাদটি টিনের। কড়িকাঠ থেকে বৈদ্যুতিক পাখা ঝুলছে। বেদীর (Altar) কাছটি দু'ধাপ উঁচু, মোজাইক করা। বেদীর পিছনে ক্রুশবিদ্ধ যীশু। সামনে বেদীর উপরে কাচের পাত্রে ক'টি মোমবাতি জ্বলছে। বেদীর সামনে বাম দিকে গির্জার পুরোহিতের জন্য কাঠের স্ট্যান্ড। ডান দিকে একটি ছোট টেবিলের উপরে শ্বেত পাথরের মা মেরীর কোলে শিশু যীশু।

জানালা দিয়ে সকালের নরম আলো প্রবেশ করে হলরুমের ভিতরে প্রার্থনারত মানুষগুলোকে অন্য এক স্নিগ্ধতা দিয়েছে। সাত্যকি পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসেছেন। বছরের প্রথম প্রার্থনা। শুভ দিনগুলোতে তিনি সবাইকে নিয়ে প্রার্থনায় যেতে পছন্দ করেন। গির্জার প্রার্থনাকক্ষের আসনগুলো আগেই ভরে গিয়েছে। অল্প কয়েকটি বাঙালি পরিবার, বাকিরা স্থানীয় আদিবাসী। রিয়ানা লক্ষ্য করে ঘরের কোণটিতে যেখানে দুটো টিনের চাল এসে মিলেছে, সেখানে খড়-কুটো দিয়ে কবুতর বাসা বানিয়েছে; প্রভুর ঘরে সবার জন্য স্থান আছে, ভাবলো সে। শেষ কড়িবরগার উপরে একটি কবুতর বসে ঘাড়টি বাঁকা করে পুরোহিতের প্রার্থনা শুনছে। পুরোহিত ভরাট কণ্ঠে প্রার্থনা করছেন—

'As this New Year commences, let us remember the past year and truly repent of all that has hindered us from abiding you...

Let us recall the things that hindered us from getting closer to You and keeping Your word. Help us Lord, to be willing to forgive ourselves and forgive one another. In Jesus's name, Amen.'

সমস্বরে ভিতরের আলোকিত মানুষগুলো বললেন, 'আমেন।'

গির্জা থেকে বেরিয়ে সাত্যকি সুতপাকে বললেন, 'আমি মঞ্চ প্রস্তুতি দেখে আসি, তোমরা বাসার দিকে এগোও।'



'বাবা, আমি মেলায় যাবো,' রিয়ানা বাবার হাত ধরে বললো।

'আচ্ছা, চল সবাই যাই, মেলা আর সন্ধ্যার অনুষ্ঠান তো একই মাঠে,' সাত্যকি সম্মতি দিলেন।

কাগজকল স্কুল মাঠের উত্তর দিকে স্কুল দালান ঘেঁষে মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। সামনে বিশাল প্যান্ডেল, বাকি মাঠ জুড়ে মেলার আয়োজন।

'লিখন, ওদের মেলা ঘুরিয়ে দুপুরের মধ্যে বাসায় ফিরে যাবি,' বলে সাত্যকি মঞ্চের দিকে গেলেন।

'ভাইয়া, আগে নাগরদোলায় চড়বো। বাঁদর নাচ দেখবো। তারপর চুড়ি কিনে দিবা। সব ঘুরে দেখবো।' তড়বড় করে বলতে থাকে রিয়ানা।

'হয়েছে, থাম সব হবে।' ছোট বোনের হাত ধরে নাগরদোলার দিকে এগোয় লিখন।

'দাঁড়াও, ভাইয়া। কি সুন্দর চুড়ি!' রিয়ানা নাগরদোলার কাছেই চুড়িওয়ালির কাছে বসে পড়লো। অসাধারণ পশরা সাজিয়ে বসেছে, নানা রঙের কাচের চুড়ি। অনেক বেছে শেষমেশ এক ডজন লাল আর এক ডজন হলুদ চুড়ি কিনে সাথে সাথেই দু'হাতে পড়ে নিলো। মেলায় এক কোণে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় মাইকে বাজছে—

'আঁর বন্ধু বৈশাখী হুরপরি ফুলপরি
পান চাবাই মুখ লাল গরি
একখান বছর পরে আবার আইস্যে নাইয়রী,
ও ছকিনা ও জরিনা আগ বাড়াই ল তড়াতড়ি।'

নাগরদোলায় ওরা চার ভাই-বোন এক খোপে উঠেছে। সোহানা ভয়ে খোপের হাতল চেপে ধরলো।

'ধ্যাৎ, আপু তুমি একটা ভিতুর ডিম, এই ভাইয়া আরো জোরে ঘুরাতে বলো।' উত্তেজনায় রিয়ানার নাকের পা'টা ফুলে উঠেছে। সূর্যের কড়া কিরণে রিয়ানার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে আর গাল লালচে হয়ে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। আরও উপরে উঠতেই টিলাগুলোর উপরটা

মনে হলো ঢেউ খেলানো সবুজ চাদর বিছানো। অদূরে কর্ণফুলীর সবুজাভ নীল জলরাশি। আরও দূরে এলোমেলো পাহাড়ের সারি। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় রিয়ানার ওড়না উড়তে থাকলো, ও একহাতে ওড়না ধরে আছে, অন্য হাতে সোহানার হাত আঁকড়ে রাখলো। মেলার আরো দূর থেকে যেন রিয়ানার উদ্দেশেই বেজে উঠেছে—

'হাওয়া মে উড়তা যায়ে,
মেরা লাল দোপাট্টা...মল মল কা
হো জি... হো জি।'



## ৫

গেট থেকে প্যান্ডেল পর্যন্ত পথটির দু'পাশে কলাগাছ আর নকশা আঁকা মাটির হাঁড়ি দিয়ে সাজানো হয়েছে। বাঁশের সাথে মাঝে মাঝে হারিকেন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে—যেন আলোআঁধারির মায়াবী পথ। মঞ্চের পিছনে সাদা পর্দার উপরে বৈশাখকে আহ্বান করে লেখা 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...।' ওর চারদিকে রঙিন আলপনা আঁকা। রিয়ানা আর স্মৃতি ফুলের তোড়া হাতে মঞ্চের সামনে অপেক্ষা করছে। ম্যানেজার সাহেব সপরিবারে এলেই অনুষ্ঠান শুরু হবে। সাদা জামদানী শাড়ী, পাড়ে লাল কলকা ও আঁচলে ময়ূর নকশা আঁকা, লাল ব্লাউজ পরিহিতা এক পৃথুলা রমণী ওর সামনে আসতেই ফুলের তোড়া বাড়িয়ে দিয়ে রিয়ানা বললো, 'স্বাগতম, শুভ নববর্ষ।' ম্যানেজার সাহেবের স্ত্রী ওর থুঁতনি ধরে আদর করে বললেন, 'ও মা, তুমি কে গো! তোমাকে তো ভীষণ সুন্দর লাগছে। এটা কী ফুল?'

'রঙ্গন, আপনাকেও অনেক সুন্দর লাগছে।' রিয়ানার চটপট উত্তর। পৃথুলা রমণী ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি খুব মিষ্টি মেয়ে।'

রিয়ানা গ্রিনরুম থেকে সোহানাকে দেখছে, একদল রঙিন পরীদের মধ্যমণি হয়ে সমবেত সঙ্গীত গাইছে,

'এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।
মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা...'

প্যান্ডেলের পুরোটাই দর্শকে ভরে গেছে। মঞ্চ থেকে সামনে তাকিয়েই একটু ঘাবড়ে গেলো রিয়ানা, এত মানুষ! ডানে উইংসের পাশে মা দাঁড়িয়ে আছেন, হাত তুলে ভরসা দিলেন। সোহানা ওকে অসাধারণ সাজিয়েছে। লাল শাড়ী, হলুদ ব্লাউজ হাতাটি একটু লম্বা কনুইয়ের আগ পর্যন্ত, আর বাজুতে, গলায় রঙ্গনের মালা, লাল ক্লিপ

দিয়ে অবাধ্য চুলগুলো আটকে দিয়েছে, লাল লিপস্টিক, কপালে বড় লাল টিপ। সব মিলিয়ে যেন মঞ্চে শিমুল বনের আগুন ধরেছে। হারুনের তবলার সাথে সাথে ওদের যত ভয় সব কেটে গেলো। মনের আনন্দে মঞ্চের এপাশ থেকে ওপাশ সাবলীলভাবে ভেসে বেড়ালো—

'কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥'

নাচ শেষ করে এক দৌড়ে গ্রিনরুমে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো রিয়ানা। উত্তেজনায় নাকি ভয়ে—এখনো কাঁপছে সে। প্যান্ডেলে দর্শকদের করতালির শব্দ গ্রিনরুম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

'মা-রে, খুব সুন্দর নেচেছিস। এবার আমাকে ছাড়। এই গানের পরেই আমার মঞ্চে উঠতে হবে।'

সুতপা মেয়ের কপালে স্নেহের চুমো দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন। রিয়ানা তার বান্ধবীর সাথে প্রথম সারির সামনে মাটিতে তেরপলের উপরে গিয়ে বসলো। ওর স্কুলের সবাই সামনেই বসেছে।



## ৬

সাত্যকি ও সুতপা দুজনেরই 'রক্তকরবী' নাটকটি ভীষণ প্রিয়। সেই ১৯৭৬ সালে যখন গোলাম মোস্তফা আর দিলশাদ খানমের অভিনয়ে প্রথম মঞ্চায়ন দেখেন তখন থেকেই এর প্রেমে পড়েছেন। যখনই সুযোগ মিলেছে তখনই ওরা দুজনে এই নাটকটিতে অভিনয় করেছেন। 'রক্তকরবী' একটি অসাধারণ নাটক। লোভ, মোহ, লালসা মানুষকে গ্রাস করে, এক অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে মানুষেরা। নাটকটিতে নন্দিনী সৌন্দর্য এবং প্রেমের প্রতীক। সে ওই অন্ধকার জগতের একমাত্র আলো। রাজা, অধ্যাপক, সর্দার, কিশোর, বিশু সবাই নন্দিনীকে পেতে চায়। শক্তি দিয়ে ভালোবাসা করায়ত্ব করা যায় না, রাজাও পারেন নি। অন্যেরা মোহে পারে নি। নন্দিনীর ভালোবাসা রঞ্জন। রঞ্জনের জন্যেই ওর অপেক্ষা।

দর্শক অধ্যাপকরূপী কবির (স্কুলের বাংলার শিক্ষক) আর নন্দিনীরূপী সুতপার কথোপকথন মোহাবিষ্ট হয়ে শুনছে,

'অধ্যাপক। নন্দিনী! যেয়ো না, ফিরে চাও।

নন্দিনী। কি অধ্যাপক।

অধ্যাপক। ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন? যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী। আমাকে তোমার কিসের দরকার।

অধ্যাপক। দরকারের কথা যদি বললে, ঐ চেয়ে দেখো। আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা-মাথায় কীটের মতো সুরঙ্গের ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে, এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ঐ ধুলোর নাড়ির ধন সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।

নন্দিনী। বারে বারে ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক।

অধ্যাপক। সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো।'

অধ্যাপকের প্রশস্তি কিংবা নেপথ্যে থেকে রাজার (সাত্যকি) আকুতি 'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।' কোনটাই নন্দিনীর মতো রিয়ানাকে আকর্ষণ করে না। রিয়ানা মনের মাঝে ওর 'রঞ্জনের' প্রতিচ্ছবি আঁকছে। কেন যেন ঐ ছবি আঁকা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। সারাটি জীবন ওই অসম্পূর্ণতা রিয়ানাকে তাড়া করবে।

হাতের কাছে পিছন থেকে মৃদু টান অনুভব করে রিয়ানা, পিছন না ফিরেই বুঝতে পারে হাতটি হারুনের।

কি?

খুব সুন্দর নেচেছো।

তো...

'এই নাটক দেখার কী আছে, চল ওই দিকটায় ঘুরে আসি।' বলতে বলতে হারুনের হাত কনুই থেকে কোমরে নেমে আসে। 'হাত সরাও হারুন ভাই,' হিস হিস করে বলে রিয়ানা। পিছনের প্রথম সারি থেকে কেউ একজন বলে উঠলেন, 'এই ছেলে মেয়েদের মধ্যে তুমি কেন বসেছ?' বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হারুন উঠে গেলো।

রিয়ানা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নন্দিনীকে শুনছে, নিজের হাতের-গলার রঞ্জনের মালায় আনমনা কোমল হাতে স্পর্শ করছে, অনুভব করছে, গা কাঁটা দিয়ে উঠছে—



'রঞ্জন কখনো কখনো আমাকে আদর করে বলে রক্তকরবী। জানি না আমার কেন মনে হয় রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ লাল। এই যে আমি গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, এই যে এই যে আমি হাতে পরেছি।'

কৈশোর না ছোঁয়া এক কিশোরী এক সন্ধ্যায় অনেক পরিণত বয়সে পৌঁছে গেলো।

## ৭

যখন টুনটুনি ফোন করেছে তখন মধ্য দুপুর। হাসানের অফিস বনানীতে একটি ভাড়া অ্যাপার্টমেন্টে। সে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা করে। তিনটি কক্ষসহ একটি ছোট অফিস তার জন্য উপযুক্ত। গল্‌ফ কোর্সের দিকে তাকিয়ে থাকা মাস্টার বেডরুমটি তার চেম্বারে পরিণত হয়েছে। ব্যবসা পরিচালনার জন্য তার পাঁচজনের একটি ছোট দল রয়েছে।

হাসান সেল ফোনটি তুলে অপর দিক থেকে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। মৃদু কণ্ঠে বললো, 'হ্যালো, আমি জানি আপনি আছেন। কোন সমস্যা আছে? আমি কি পরে ফোন করবো?'

'না না না, ঠিক আছে। আমি শুধু তোমার কণ্ঠটা আর একটু শুনতে চেয়েছিলাম,' বললো হাসান।

'আপনি এতে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। আমি একটু বেশি কথা বলি।'

'আমি একজন ভালো শ্রোতা।'

'হুম সত্যিই! তারপর এটি ভারসাম্যপূর্ণ। আপনি কি এখন ব্যস্ত না?'

'লাঞ্চের সময়। কর্মীরা দুপুরের খাবার খেতে চলে গেছে। আমি এখন কিছুটা স্বাধীন। তোমার খবর কি? তুমি কেমন আছো?'

'আমি ভালো আছি। কেবলি ঘুম থেকে উঠেছি। আসলে আমি আগেই ঘুম থেকে উঠেছি। আমার মেয়েকে স্কুলে পাঠালাম। কাজের মেয়েটিকে সব বুঝিয়ে দিয়ে তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। আমার মেয়ে এখনই ফিরে আসবে।'

তাদের খুচরো কথা কিছু সময়ের জন্য চলতে থাকে। শীঘ্রই দেখা করা ও কফি পানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কথা শেষ হয়। হাসান মুঠোফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ও সেই কণ্ঠের কথা ভাবতে থাকে। এতে মাদকতাময় কিছু আছে। ও  কণ্ঠটি আবার শুনতে পছন্দ করবে। হাসান পশ্চিমের জানালায় ভিনিসিয়ান ব্লাইন্ডটিকে সরিয়ে গল্‌ফ কোর্সের



দিকে তাকালো। তার উচ্চতা থেকে সে প্রধান সড়ক, রেললাইন এবং প্রায় পুরো গল্‌ফ কোর্স দেখতে পায়। হাসান গল্‌ফ কোর্সের ভূমির বিন্যাস পছন্দ করে; চারদিকে সবুজ গালিচার মাঝে মাঝে ফুলের বাগানের রঙের ছোঁয়া আর স্থির জলের পুকুর পাড়ে ধ্যানমগ্ন বক। উপরে নীল আকাশে সাদা মেঘে ভেসে যাচ্ছে অনায়াসে। সে গানের সুরে মৃদু শিস দিলো—

'শ্রাবণের মেঘগুলি জড়ো হলো আকাশে
অঝোরে নামবে বুঝি শ্রাবণেই ঝরায়ে
আজ কেন মন উদাসী হয়ে
দূর অজানায় চায় হারাতে।'

৮

প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেলো যখন হাসানের মনে পড়লো যে টুনটুনির সাথে কফি পানের জন্য একটা সন্ধ্যা বেছে নিতে হবে। সে একটি সরকারি অফিসের জন্য হাইড্রোলিক পাম্প আমদানিতে ব্যস্ত ছিল। হাসান চট্টগ্রামে গিয়েছিল। কাস্টমস হাউসের কর্মকর্তারা বদ্ধ উন্মাদ। সমস্ত বৈধ কাগজপত্র, বিল অব লোডিং, চালান, কাজের আদেশ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তাকে তাদের সাথে আলোচনা করতে হয়েছে আর কিছু হাত তৈলাক্ত করতে হয়েছে। চূড়ান্ত কাগজপত্র হাতে নিয়ে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কাজ শেষে বিমান বন্দরে চেক-ইন কাউন্টারের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে হাসান টুনটুনিকে টেক্সট করে BBQ-তে কফি সন্ধ্যার আমন্ত্রণ জানায়।

ঢাকা বিমান বন্দরে নেমেই হাসান গুলশানের BBQ-এর দ্বিতীয় তলার বাইরের বারান্দায় বসলো। এ বারান্দাটি তার ভালো লেগেছে; এটার কিছু গোপনীয়তা আছে। লোকেরা আপনাকে বা আপনার সঙ্গীর দিকে তাকাচ্ছে না বা আপনি কী খাচ্ছেন তা দেখছে না। কেউ তাকিয়ে থাকলে সে বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করে। এই বারান্দাটি কাঁচ ঘেরা যা ভেদ করে পাশের রাস্তার চলাচল দেখা যায়। প্রায় সাতটা বেজে গেছে। টুনটুনির এখানে সাড়ে ছয়টায় থাকবার কথা ছিল। অপেক্ষার বিরক্তিকর মুহূর্তগুলোর অবসান ঘটিয়ে টুনটুনি ঠিক তখনই ওয়েটারের পিছনে পিছনে দোতলায় প্রবেশ করে। তার সম্পর্কে সবসময় এমন কিছু থাকে যা তাকে তার চারপাশের বাকি লোকদের থেকে আলাদা করে তোলে। হাসান উঠে দাঁড়ালো, তাকে টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলো, মার্বেল মেঝেতে স্টিলেটোর ক্লিক এবং নিতম্বের দোলা তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। সে একটি কালো পালাজ্জো পরেছিল, একটি ছোট হাতা সাদা ফ্লোরাল গোল গলা সুতির টপস এবং সামনে একটি বেশ খানিকটা কাটা এবং একটি বো দিয়ে আটকানো। টুনটুনি সবসময় একটি বড় ভ্যানিটি ব্যাগ বহন করে; এবারেরটি কালো রঙের লুই ভুঁত।

দেরী হওয়ার জন্য সে বিব্রত নয় এবং এটি সম্পর্কে কোনও উল্লেখও করলো না। তারা এমনভাবে আবহাওয়া, হাসানের চট্টগ্রাম



ভ্রমণ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে যেন মেনু বুকলেট নিয়ে ওয়েটার না আসা পর্যন্ত দুজনেই মাংসাশী প্রাণীর মতো একে অপরকে মাপতে থাকে।

'আমি স্যুপ পছন্দ করি,' টুনটুনির এই অভিমত ব্যক্ত করার পর বাতাসে বিরাজমান চাপা উত্তেজনা একটু হালকা হলো। আরো কিছু সময় এলোমেলো কথা বলার পর ওরা ক্রিম অব মাশরুম স্যুপ, চিকেন টেন্ডার স্ট্রিপস সালাদ এবং গোচুআং চিকেন উইথ শ্রিম্প ফ্রাইড রাইস এবং চিজ কেক অর্ডার করে।

টুনটুনি তার সম্পর্কে, তার সন্তান সম্পর্কে, স্বামী সম্পর্কে এবং বেশিরভাগই তার সম্পর্কে কথা বলতে থাকে। হাসান মনোযোগ সহকারে ঠোঁটের নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ করছে। ও যখন কোনও বিষয়ে জোর দেয় তখন কীভাবে নাকের ছিদ্র ফুলে যায়, অভিনয়ের কথা বললে তার চোখে তারার ঝিকিমিকি খেলে যায়; বোঝা যায় তার ভালোবাসার জায়গা। তার চিবুকের উপর একটি গভীর খাদ তাকে খুব আকর্ষণীয় করে তোলে। যখন তারা খাবার খেয়ে চলেছে, সে ক্রমাগত তাকে আরও বেশি খাওয়ার জন্য জোর দিয়েছিলে। যতদূর মর্যাদা অনুমতি দেয় হাসান প্রতিরোধ করে। টুনটুনি ভীষণ প্ররোচক, প্রাণবন্ত এবং জীবনপূর্ণ, হাসান অনুভব করেছিল। হাসান তার উপস্থিতি পছন্দ করেছে।

যখন তারা নেমে এসে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে তখন সে অনুরোধ করে, 'চলেন হাতিরঝিল যাই।' হাসান ইতস্তত করে। 'এখন কেবল দশটা বাজে', সে জোর দিয়ে বলে। অনিচ্ছায় হাসান রাজি হয়। সে খুব বেশি উৎসাহী হতে চায়নি, প্রতিরোধও করেনি। হাসান তার গাড়ি অফিসে ফিরে তার জন্য অপেক্ষা করতে বলে।

তারা মূল রাস্তায় গাড়ি রেখে সেতুর পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকে। কয়েক মাস আগে এখানে একটি সিনেমার দৃশ্যের শুটিং হয়েছিল, টুনটুনি জানায়। 'সত্যিই!' হাসান প্রায় চিৎকার করে বললো। 'হুম, ইন্ডাস্ট্রিতে আমি রিয়ানা নামে পরিচিত,' সে আর কিছু যোগ না করে বিড়বিড় করে বললো। তারা কেন্দ্রের কাছে দাঁড়ানোর জায়গা পেয়েছে।

সেতুগুলো সুন্দরভাবে আলোকিত। আলোর রং বেগুনি থেকে সবুজ থেকে কমলা থেকে নীল হয়ে যায়। পানিতে প্রতিফলন জাদুকরী। ওরা কথা বলে না, শুধু পাশে দাঁড়িয়ে থাকে রেল ধরে আর বিস্ময় উপভোগ করছে। কিছুক্ষণ পর, সে তার উপর একটি নরম হাত অনুভব করলো, দৃশ্যত সে আরও কাছে চলে এসেছে। সে একটু ঠাণ্ডা অনুভব করলো। হাসান একটুও চিন্তা না করে ডান হাতটা তার চারপাশে জড়িয়ে তাকে কাছে নিয়ে এলো। সে তার দিকে তাকিয়ে হাসলো, তারপর জলের দিকে ফিরে তাকালো।

'আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দুখানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি,
হাসিলে ফুটিয়া পরে ঊষার আভাস।' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



## ৯

রিয়ানা রিকশা নিয়ে চট্টগ্রাম কলেজে গেল; সে প্রথম বছরের প্রথম ক্লাসের জন্য দেরী করেছিল। রিকশাওয়ালা হুডটা সামনের দিকে টেনে নিতে চাইলো, রিয়ানা তাকে তা করতে নিষেধ করলো। ও হুড দিয়ে আচ্ছাদিত করা পছন্দ করে না। কেননা এতে সে চারপাশ দেখতে সক্ষম হয় না। গত কয়েক মাসে তার জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; পরিবার এখনও পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করছে। তার বাবা চাকরি থেকে অবসর নেন, সে তার এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ওরা চট্টগ্রামে চলে এসেছে। ওরা মোমিন রোডে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে, জঘন্য হলুদ রঙের একটি পুরানো জরাজীর্ণ তিনতলা দালান, দেয়ালের প্লাস্টার খসে পরছে অনেকটা বৃদ্ধ কুকুরের লোম ওঠা শরীরের মতন; সানশেডগুলি বেশিরভাগ ঘাস এবং আগাছা দিয়ে আচ্ছাদিত। রিয়ানার যেটা ভালো লেগেছিল সেটা হল বাড়িটা নয়, সামনে দালান ছাড়িয়ে দুটো খুব লম্বা তালগাছ যেন তার প্রাসাদ পাহারা দিচ্ছে।

রিকশাটি আন্দরকিল্লা থেকে বাঁ দিকে মোড় নেয় কলেজ রোডে; পথচারী, অন্য রিকশার যাত্রীরা, বাই-সাইকেল চালক এমনকি মোটর সাইকেল চালকদের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ রিয়ানা অনুভব করে। মাঝে মাঝে সে তাদের অসহায়ত্ব দেখে হাসে। ও মনোযোগ উপভোগ করে, মাথা উঁচু রাখে এবং চোখ না নামিয়ে মানুষগুলোকে দেখতে থাকে। সে খুব আকর্ষণীয় তরুণী হয়ে উঠেছে; দীর্ঘাঙ্গী এবং কৃশতনু। যখন চারপাশের অন্যদের বামন করে সে যখন সোজা হয়ে বসে তখন সে চারটি সাদা ঘোড়া দ্বারা টানা একটি গাড়িতে বসা সিন্ডারেলার মতো অনুভব করে। সে তার ভাবনায় ভিতরে হারিয়ে গেল; রিকশার ঘন্টা তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছে। সে তাড়াতাড়ি ভাড়া প্রদান করে এবং দ্রুত পদক্ষেপে তার ক্লাসে শ্রেণী শিক্ষকের ঠিক আগে পৌঁছায়। রিয়ানা প্রায় পিছনে একটি আসনে বসে পরে। শিক্ষক জানান যে আজ কোন ক্লাস হবে না। তারা ওরিয়েন্টেশনের অংশ হিসেবে কলেজ ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াবে এবং ক্লাসের রুটিন দেওয়া হবে।

'তুমি কি ক্যাম্পাসের চারপাশে ঘুরতে থাকা ভেড়ার পালের অংশ হতে চাও, না কি আমরা নিজেদের মত করে ঘুরবো?' পাশে বসা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো রিয়ানা। হঠাৎ প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়ায় মৌমিতা হতবাক হয়ে যায়। এমনকি ও নিজের পরিচয়ও দেয় নি। সে তোতলালো 'ওহ! উহু! হুম, ঠিক আছে, আমি মৌমিতা।'

'আমি জানি. এটি তোমার নোটবুকে বড় করে লেখা আছে। আমি তোমাকে মৌ নাকি মিতা বলে ডাকবো? আমি রিয়ানা এবং আমাকে আনা ডেকো না। আমি রিয়ানা,' রিয়ানা বলে। সঙ্গে সঙ্গে মৌমিতা তাকে পছন্দ করে।



## ১০

ড্রামা ক্লাবের রিয়ানা এবং তার বন্ধুরা চট্টগ্রাম কলেজে আজকের সন্ধ্যায় নবীনবরণ অনুষ্ঠানের জন্য এক সপ্তাহের মহড়া দিয়েছে। অনুষ্ঠানটি ঐতিহাসিক প্যারেড গ্রাউন্ডে করা হয়েছে, যাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী উপভোগ করতে পারে। নবীনদের জন্য একটি চল্লিশ মিনিটের স্লট বরাদ্দ করা হয়েছে। রিয়ানার দল একটি দলগত নাচ দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু করবে। পূর্ণেন্দু পত্রীর 'কথোপকথন' থেকে আবৃত্তি করবে রিনা ও তার সহপাঠী আবির এবং তারপর কয়েকটি গান। সন্ধ্যার নামাজের পর মঞ্চে আসবে বিখ্যাত ব্যান্ড 'সোলস'।

প্রোগ্রামটি ধীর গতিতে শুরু হয়েছিল, শিক্ষার্থীরা পরবর্তী পর্বে দ্রুত এগিয়ে যেতে আগ্রহী। অস্থির দর্শকদের বিড়াল ডাক আর শিস হঠাৎ থেমে যায়, যখন রিয়ানা এবং আবির মঞ্চে প্রবেশ করে তাদের নির্ধারিত স্থানে দাঁড়ায়। কেবল ওদের উপর পড়া স্পটলাইট ব্যতীত সমস্ত আলো বন্ধ করা হয়েছে। রিয়ানা একটা সাদা শাড়ি পরেছিল, তার পাড় উজ্জ্বল লাল, লাল ব্লাউজ, সাদা জুঁই দিয়ে তৈরি একটা টিয়ারা, চোখের ভ্রূর মাঝে তার কপালে চাঁদের আকৃতির লাল টিপ ছবিটা সম্পূর্ণ করেছে। শ্রোতাদের মধ্যে অনেক তরুণের হৃদয় স্পন্দন বন্ধ। সাদা রঙের হাই নেক পাঞ্জাবি আর সাদা চুড়িদার পরা আবির ছিল সহজ সরল। তারা শুরু করার সাথে সাথে দর্শকদেও মধ্যে একটি পিনড্রপ নীরবতা।

রিয়ানাঃ তুমি আজকাল বড্ড সিগারেট খাচ্ছ শুভঙ্কর।
আবিরঃ এখুনি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। কিন্তু তার বদলে??
রিয়ানাঃ বড্ড হ্যাংলা। যেন খাওনি কখনো?
আবিরঃ খেয়েছি। কিন্তু আমার খিদের কাছে সে সব নস্যি।
আবিরঃ পৃথিবীর কাছে আমি এই রকমই ভয়ংকর বিস্ফোরণ।
কেবল তোমার কাছে এলেই দুধের বালক,

কেবল তোমার কাছে এলেই ফুটপাতের নুলো ভিখারি, এক পয়সা, আধ পয়সা কিংবা এক টুকরো পাউরুটির বেশী আর কিছু ছিনিয়ে নিতে পারি না।

রিয়ানাঃ মিথ্যুক।

আবিরঃ কেন?

ডরয়ানাঃ সেদিন আমার সর্বাঙ্গের শাড়ি ধরে টান মারনি?

আবিরঃ হতে পারে। ভিখারিদের কি ডাকাত হতে ইচ্ছে করবে না একদিনও?

সকল বয়সী দর্শক আবিরের প্রতিধ্বনি করে ডাকাত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। করতালি আর শিসের মধ্যে তারা মঞ্চ থেকে নেমে আসে।

ওদের পারফরম্যান্স-এর পরেই অনুষ্ঠানের খানিক বিরতি। মৌমিতা আর রিয়ানা মাঠের কোণে দাঁড়িয়ে দুই প্লেট ফুচকা অর্ডার করলো। তারা কাঠের ভাঁজ করা চেয়ারে বসে অতিরিক্ত টক সস ও বোম্বে মরিচের ঝাল দিয়ে ফুচকা খেতে লাগলো। যখন তারা ফুচকাওয়ালাকে টাকা দিতে এগিয়ে যায় তখন তাদের জানানো হয় যে কোণে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোক ইতোমধ্যেই তাদের বিল প্রদান করেছেন।

'কেন আপনি ফুচকার বিল দিয়েছেন?' রিয়ানা জিজ্ঞেস করলো।

'আমি আপনার নাটক পছন্দ করেছি। আসলে আমার অসম্ভব ভালো লেগেছে। এটাকে আমার ভালোলাগার প্রতিদান হিসেবে ধরুন, অন্তত এটুকু আমি করতেই পারি।' ভদ্রলোক বললেন।

'না, না, না, এটা ঠিক নয়।' রিয়ানা প্রতিবাদ করে।

'এটা বড় ব্যাপার নয়, দয়া করে গ্রহণ করুন। আমি বরং আপনার পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি দিতে পেরে খুশি,' তিনি বলেছিলেন।

'তাহলে তার দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য, সে কেবল ফুচকা খেতে পায়?' মৌমিতা উপহাস করে।



'অবশ্যই সে আরও ভালো প্রাপ্য। যদি আপনারা দু'জন আমাকে অনুমতি দেন, আমরা হয়তো একদিন লাঞ্চ বা ডিনারের জন্য কোথাও বসতে পারি।' সে প্রস্তাব দেয়। যাই হোক আমি শরীফ। আমি থিয়েটার গ্রুপের একজন সদস্য, তিনি যোগ করেন।

'হুমম, ঠিক আছে, হতে পারে...।' রিয়ানা লজ্জা পায়। শরীফ বেশ লম্বা ও পাতলা। তার শরীরে এক বিন্দু মেদ নেই, তীক্ষ্ণ নাক, হাস্যোজ্জ্বল চোখ, চুল যথাযথভাবে ছোট করে কাটা। তার পরনে কালো ট্রাউজার ও কালো পোলো শার্ট ছিল। রীনা চোখের কোণ থেকে আবার ওর দিকে তাকালো। তিনি তার সাথে একটি সংযোগ অনুভব করেছিলেন। মৌমিতা অধৈর্য হয়ে বলে, 'চল, চল যাই, কনসার্ট উপভোগ করার জন্য আমাদের আরও ভালো জায়গা খুঁজতে হবে।'

শরীফ তাদের কনসার্টে নিয়ে যায় এবং একটি উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পায়। প্যারেড গ্রাউন্ড পরিপূর্ণ, তিল ধারনের জায়গা নেই, তারা শুধুমাত্র দাঁড়াতে পারে। শরীফ সামনের বাঁধগুলো রেখে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। মৌমিতা ফিসফিস করে বলে, 'সে তোকে পছন্দ করে।' 'আহ্! আমাকে কনসার্ট উপভোগ করতে দে,' রিয়ানা মৃদু ধমক দেয়।

নাসিম আলী, তপন চৌধুরী, পার্থ বড়ুয়া মঞ্চে প্রবেশ করায় দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক হৈচৈ পড়ে যায়। বাংলাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যান্ড এবং তারা চট্টগ্রামের। কণ্ঠ যাদুকরেরা একের পর এক তাদের হিট গান গাইতে থাকেন। শ্রোতারা উন্মত্ত যৌন উন্মাদনার মতো উচ্ছ্বাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। শরীফ পাশ থেকে রিয়ানার দিকে তাকালো। ঠিক তখনই তপন চৌধুরী সবচেয়ে জনপ্রিয় গানটি গাইতে শুরু করেন, 'ওহো হো ও হো, মন শুধু মন ছুঁয়েছে, সেতো মুখ খুলেনি, সুর শুধু সুর তুলেছে, কেউ জানেনি...।'

গান চলতে থাকে আর রিয়ানা স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে কণ্ঠের যাদুকরের দিকে। তার নাসারন্ধ্র ফুলে গেছে। সে শ্বাস আটকে রেখেছে। গানটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে রিয়ানার মনে হয় একটা অর্গ্যাজমিক

অনুভূতি ছিল। সে লজ্জা পেয়ে শরীফের দিকে ফিরে তাকালো সবচেয়ে মিষ্টি হাসি দিয়ে—যা শরীফ এর আগে কখনও দেখেনি।

'কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তাঁরি মাঝখানে কি রে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয়!' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



## ১১

'শুধু একবার দেখবো তোমাকে
তার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা
এই ঢেউ গোনা' —মহাদেব সাহা

খোলা জানালার পাশেই রিয়ানার পড়ার টেবিল। নীচে পাকা সড়ক। সামনে রাখা বইতে মন বসাতে পারছে না। ওর 'নবীনবরণ' অনুষ্ঠানের সময় যে লম্বা এবং সুদর্শন সঙ্গীর সাথে দেখা হয়েছিল তার কথা মনে পড়ছে; একটি মিষ্টি স্মৃতি তার মন অতিক্রম করে। তার কথা ভাবতেই রিয়ানার মাথা ঝিম ধরে উঠেছে; সে অনুভব করল তার শরীরে এক ধরনের গরম ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। রিয়ানা কয়েকবার বলপয়েন্ট পেনের ক্যাপটা ঠিক করার চেষ্টা করেও সফল হয়নি, তার চোখ স্থির থাকে সেই বইয়ের দিকে। যার অক্ষরগুলো ঝাপসা থেকে যায়। সে চেয়ার ছেড়ে জানালার পাশে দাঁড়ায়। পুরানো প্যাটার্নেও জানালাটি যাতে উল্লম্ব ঢালাই লোহার গ্রিল উপরে থেকে নীচের দিকে সবুজ রঙে রাঙানো কাঠের একটি ব্লকের মধ্য দিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে। গ্রিলে নিশ্চয়ই কয়েক বছর আগে রঙ করা ছিল। কিন্তু এখন শুধু গাঢ় বাদামী। সে সেগুলোকে তার দুই হাতের তালুতে ধরে রাখে; গ্রিল গুলো ঠাণ্ডা কিন্তু তা ওর নরম চামড়া ভেদ করে না। গ্রিলের প্রশান্তিদায়ক শীতলতা তার হাত, ঘাড় এবং মুখ উপরিভাগ দিয়ে ভ্রমণ করে তার চোখ অবধি পৌঁছায়। রিয়ানা চোখ বন্ধ করে গ্রিলের উপর ওর কপাল স্থির করে এবং তাজা বাতাস ওর মুখে স্নেহের পরশ বুলায় এই আশায় যে, তার মন থেকে শরীফের ছবি বাষ্প হয়ে উবে যাবে। জুঁই ফুলের মিষ্টি অথচ মাতাল সুবাস নাকে এসে পৌঁছায়। সে যতটুকু পারছে গভীর শ্বাস নিল। সুবাস তার শরীরে তার মন ও হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে। আর তার ছবি দেখে মনে হলো সেই জুঁইয়ের সুগন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে তার হৃদয়ের গভীর গহ্বরে প্রবেশ করছে। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিল। তবুও তাকে আবার দেখতে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার হৃদয়ে ঝুলে ছিল। তার কাঁধে একটি হাতের স্পর্শে সে শান্ত হয়। সুতপা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'সন্ধ্যায় জানালার পাশে কি করিস?' 'কিছুই না মা।' রিয়ানা উত্তর দেয়।

সকালে কলেজে যাওয়ার সময় সে বিল্ডিংয়ের সিঁড়ির কাছে জুঁই গাছ থেকে এক মুঠো ফুল সংগ্রহ করে। তাকে কলেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাসিক একটি রিকশা ভাড়া করা হয়েছে। সামনেই অপেক্ষা করছে। রিয়ানা এতে চড়ে বসে। সে গর্বভরে তার রথে চড়ে হাত ভরা ফুল নিয়ে পথচারীদের তাকিয়ে থাকা উপেক্ষা করে কলেজের দিকে যেতে থাকে। কলেজের গেটে পৌঁছলে সেই লম্বা এবং সুদর্শন যুবক তাকে অভ্যর্থনা জানায়। সে লজ্জিত হয়ে শরীফের হাতে ফুল তুলে দিয়ে 'অপেক্ষা করুন' বলে প্রায় দৌড়ে কলেজের ভিতরে চলে যায়।

শরীফ অপেক্ষা করছে। রিয়ানার ফিরে আসার কোনো লক্ষণ ছাড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো। কলেজ গেটের পাশে চায়ের স্টলের সামনে কাঠের বেঞ্চিতে বসে এক কাপ কালো চায়ের অর্ডার দেয়। শরীফ ছোট চুমুক দিয়ে চায়ের স্বাদ নিতে নিতে চায়ের দোকানের মালিকের সাথে আলাপচারিতায় মগ্ন হয়। তাকে জানানো হয় যে যখনই রিয়ানা কলেজে আসে তখন সবসময় গেটে ভিড় থাকে। যারা নীরবে অপেক্ষা করে এবং রিয়ানা ভিতরে যাওয়ার সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ে। চা স্টলের মালিক হেসে বলে, 'আপনিই ভাগ্যবান যে ফুল পেয়েছেন।' শরীফ এ মন্তব্যের কোনো জবাব দেয়নি। তিনি একটি ৫৫৫ সিগারেট জ্বালিয়ে নিঃশব্দে ধূমপান করেন। তিন কাপ চা আর সিগারেট খাওয়ার পর রিয়ানা গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো। রিয়ানা ডানে-বামে তাকালো। 'আহ্, আপনি এখনো আছেন!' সে বেঞ্চে বসা শরীফকে দেখে বিস্মিত হয়ে চিৎকার করে।

'তুমি আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছো।'

'হ্যাঁ, বলেছি, চলেন।'

শরীফ মোটর বাইক স্টার্ট দিল। রিয়ানা বাইকের পিছনে বসে শরীফের কাঁধে নিজের ডান হাত তুলে দিয়ে ভারসাম্য ঠিক করলো। এরপরে জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'তোমাকে থিয়েটারের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির জন্য আমরা ওদের অফিসে যাচ্ছি।' শরীফ জানালো।



'এটা খুবই ভালো হবে, আমি সবসময়েই নাট্য দলের সদস্য হতে চেয়েছি।'

'বেশি উত্তেজিত হয়ো না। নতুন সদস্যরা জ্যেষ্ঠ শিল্পীদের ফুটফরমায়েস খাটে। কোনো নাটকে কোনো চরিত্রে, সেটি যত ছোট চরিত্রই হোক না কেন, অভিনয় করার সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।'

'হমম, দেখি,' আত্মবিশ্বাসের উত্তর দেয় রিয়ানা।

থিয়েটার নাট্য দলটির অফিস কাম রিহার্সেলের জায়গাটি মেহেদিবাগে। ওরা কয়েক মিনিটে পৌঁছে গেল। শরীফ নতুন সদস্যপদের একটি ফর্ম এনে রিয়ানার তথ্য পূরণ করে রিয়ানার স্বাক্ষর নিয়ে দলের সচিবের হাতে তুলে দিলো। রিয়ানার মৃদু আপত্তি স্বত্বেও সদস্য চাঁদা দিয়ে দিয়েছে।

শরীফ রিয়ানার দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, 'অভিনন্দন! আমরা এখন থেকে সহশিল্পী।'

লাজনম্র স্মিত হেসে রিয়ানা 'ধন্যবাদ' জানালো।

'এই রাস্তা ধরে একটু এগোলেই কফি শপ আছে, চলো বসি।' শরীফ অনুরোধ করলো।

'চলেন।' রিয়ানার মৃদু সম্মতি।

ওরা কফিশপের দোতলায় গিয়ে বসলো। কক্ষটি আয়তাকার, একটি প্রান্তে পাশের রাস্তার দিকে বড় কাঁচের জানালা। জানালাগুলোয় কমলা আভাযুক্ত উজ্জ্বল লাল রঙের পর্দা ঝুলছে। প্রবেশপথের সাথেই ক্যাশ কাউন্টার আর উল্টো দিকে পরিবেশনের স্থান। ঠিক মধ্য দুপুর। কয়েক জোড়া কপোত-কপোতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। চেয়ারে ঝুলানো অ্যাপ্রন দেখে অনুমান করা যায় এরা পাশের মেডিকেল কলেজেরই হবে।

'শোনেন, আমি কখনও কারও সাথে বাইরে যাইনি। আমি চাই না আপনি আমাকে ভুল বোঝেন।' রিয়ানা বলে।

'ঠিক আছে। আমরা সহশিল্পী এবং একে অপরকে জানার জন্য একসাথে সময় কাটানোতে কোনও ভুল নেই।' শরীফ আশ্বাস দেন।

তারা খেতে খেতে গল্প করতে থাকে। শরীফ একটি সাধারণ পরিবার থেকে এসেছে এবং ভাইবোনদের মধ্যে সবার ছোট। ও গত বছর এমন কিছু সরকারী অফিসে কাজ শুরু করেছে যাতে অফিসের বাইরে অনেক কাজ জড়িত থাকে। ও ভ্রমণ করতে পছন্দ করে এবং অভিনয় তার নেশা।

রিয়ানা বিব্রত হয়ে জানায় যে তারা খ্রিস্ট ধর্মানুসারী। বোনদের মধ্যে সে সবার ছোট, বড় বোন বিবাহিত। তার বড় ভাই একটি এনজিওতে কাজ করে, ছোট ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

'এটি আমাদের ধর্ম নয় যে আমাদের সংজ্ঞায়িত করে আমরা কী। আমরা কী বিশ্বাস করি, আমরা কীভাবে আচরণ করি, আমরা কীভাবে যোগাযোগ করি তা আমাদের মানুষ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে,' শরীফ বিনয়ের সাথে জোর দিয়েছিল। রিয়ানা সম্মত না হয়ে পারলো না।

তারা একসাথে আরও সময় কাটানোর জন্য ধীরে ধীরে খেয়েছিল। শরীফ খুব একটা খায় না রিয়ানার নজরে আসে, রিয়ানা সেটা উল্লেখ করে। শরীফ বলে, 'আমি যার সাথে আছি তার সঙ্গ আমি উপভোগ করছি।' রিয়ানা বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

'এখন প্রায় তিনটা বাজে। আমার বাড়ি যাওয়া উচিত।' সে বলে।

'অবশ্যই। আমি তোমাকে নামিয়ে দেবো।'

'না, না, না, আমি রিকশা নিয়ে যাব।'

শরীফ মোড় পর্যন্ত রিকশার দিকে তাকিয়ে রইলো। এবার রিক্সার হুড টেনে ধরলো রিয়ানা। গতকাল সন্ধ্যার মতো একই ঝিম ধরা অনুভূতি তাকে গ্রাস করছে। সে দৃঢ়ভাবে রিকশার পাশ ধরে রাখে। তার হৃদপিণ্ড ধড়ফড় করছে। সে জানে, সে তাকে আবার দেখতে চায়।

তার বাড়ির সামনে রিকশা থামার সাথে সাথে সে দ্রুত টাকা পরিশোধ করে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে,



তার মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে এবং মায়ের গালে চুমু খায়। সুতপা চিৎকার করে বলে, 'তোর কী হয়েছে?'

'কিছু না, মা।' রিয়ানা তার ব্যাগটা বিছানায় ফেলে দিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেল। সে তার পুরো পোশাকে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথা, কপাল, চোখ, নাক, চিবুক বেয়ে জলের ধারা নামছে এবং নামার পথে তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পরা অশ্রুর ফোঁটা সাথে নিয়ে মেঝেতে আশ্রয় নিচ্ছে। রিয়ানা নীরবে কাঁদে।

## ১২

'মা, মা।' কলেজের জন্যে তৈরি হতে হতে মাকে ডাকে রিয়ানা।

'ডাকিস কেন? আমার হাত ভরা কাজ।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রিমসন লাল রঙের লিপস্টিক ঠোঁটে বুলিয়ে একটু সময় নিয়ে দেখলো, হালকা ব্লাশ অন, চোখের পাতার উপর হালকা কমলার আভা, চোখের কাজল সব মিলিয়ে খুব সুন্দর লাগছে ভাবলো রিয়ানা। বাইরে বেরোতে হলে রিয়ানা সবসময়ই খুব পরিপাটি করে সাজে। আয়নাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আয়না, বল্ তো আমি কার?' আয়না বললো, 'তুমি যার, তুমি তার।'

'ধ্যাৎ, তুমি জানো না।' ভেংচি কেটে রিয়ানা আয়নাকে বললো।

'কি বিড়বিড় করিস।'

'কিছু না, মা, আমার ক্লাসের পরে রিহার্সেল আছে। ফিরতে দেরী হবে।'

'দুপুরে খাবি না?'

'না, মা, বাইরে খেয়ে নিবো। একশ'টা টাকা দাও।'

'বেশী দেরী করিস না, তোর বাবা চিন্তা করবে।'

'আচ্ছা, তুমি সামলে নিও, যাই।' টাকা ব্যাগে ভরতে ভরতে রিয়ানা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

আজকের বাংলা ক্লাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সমাপ্তি' গল্পটি পড়ানো হচ্ছে। বাংলার শিক্ষক অনিমেষ ঘোষাল বলেন, 'বাংলা জানতে হলে, বুঝতে হলে, শিখতে হলে রবি ঠাকুরকে পড়তে হবে।' তিনি সবাইকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' বইটি কিনিয়েছেন। মাসে একটি ক্লাসে পাঠ্যসূচীর বাইরে তিনি এই বইটি ওদেরকে দিয়ে রিডিং পড়ান আর পরের ক্লাসে মুক্ত আলোচনা করেন। রিয়ানা মনোযোগ দিয়ে শুনছে, কখন যে ওর পালা এসেছে



টের পায় নি। মৌমিতা বইটি বাড়িয়ে ধরে বললো, 'এখান থেকে পড়।'

রিয়ানা পড়ছে, 'মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, কী।'

অপূর্ব কহিল, 'তুমি ইচ্ছা করিয়া, ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও।'

এটুকু পড়ে রিয়ানা আর পড়তে পারলো না। লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। বইটি হাতে ধরে রাখতে পারছে না। কপালে স্বেদবিন্দু, কান দিয়ে যেন ধুঁয়া বেরোচ্ছে। ক্লাসের সবার দৃষ্টি তার উপরে এটা বুঝতে পেরে রিয়ানা মাথা নিচু করে স্তব্ধ হয়ে গেলো। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ওর মনে হল ক্লাসের ছেলেগুলো নিজেদের অপূর্ব ভাবছে। অনিমেষ ঘোষাল ওর এই অসহায়ত্ব অনুভব করলেন, 'ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্তই থাক।'

রিয়ানা হাফ ছেড়ে বসে পড়লো। মৌমিতা ফিসফিস করে বললো, 'এই অপূর্বটা কে রে?'

'চুপ কর, এখন জ্বালাইস না।'

ক্লাসের পরে রিয়ানা আর পরের ক্লাসে ফিরে গেলো না। মৌমিতাকে জানালো যে রিয়ানার রিহার্সেল আছে, মৌমিতা যেন ওর অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দেয়। ঠিক আছে, চল তোকে তোর অপূর্বর কাছে দিয়ে আসি, মৌমিতা বান্ধবীকে খোঁচালো। 'মৌ সোনা, আমার সাথে এরকম করিস না।' রিয়ানা মিনতি করে।

'ওই যে তোর অপূর্ব বাইকে বসে আছে, যা চুম্বন দিয়ে আয়।' হাসতে হাসতে মৌমিতা কুটিকুটি। 'হইছে, থাম এবার, রিহার্সেল-এ যাই, কাল দেখা হবে, বাই।' রিয়ানা ত্রস্ত পায়ে গেটের দিকে এগিয়ে যায়।

রিয়ানা বাইকে চড়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাব আমরা?'

'পতেঙ্গা যাব।'

'চলো, ওই দিকটায় যাই নি কখনো।'

আপনি থেকে তুমি তে কখন নেমে এসেছে, রিয়ানা টের পায় নি। 'শক্ত করে ধরে বসো, রাস্তা ভাঙা আছে, পড়ে যেতে পারো।' শরীফ অনুরোধ করে।

নেভি কম্পাউন্ডকে বাঁয়ে রেখে বিমানবন্দর সড়কে উঠতেই রিয়ানা কর্ণফুলীতে জাহাজের সারী দেখে বিস্মিত হয়। এত বড় বড় জাহাজ কখনও দেখেনি। 'ওই বড়গুলো তেলের জাহাজ, আর পাশেরটা সিমেন্ট এনেছে।' শরীফ জানায়। 'নদীর ওই পাড়ে ওটা কি?' 'ওটা সার কারখানা।'

'আমরা শেষ মাথায় যাব, রেড কিন পয়েন্ট। ঢুকতে দেয় না, আমার এক বন্ধু আছে বলে রেখেছি। ওখান থেকে বিচে যাবো।' বাইক চালাতে চালাতে শরীফ জানালো।

গেটের বাইরে বাইক রেখে ওরা পায়ে হেঁটে শেষ মাথায় পৌঁছালো। অসাধারণ দৃশ্য, বিমুগ্ধ রিয়ানা। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানটার সামনে থেকে পাথরের সারি সমুদ্রের বুক চিরে অনেক দূর গিয়েছে। কর্ণফুলী যেখানে সমুদ্রে এসে মিশেছে সেখান থেকে ভিতর দিকে নদীর পানি ঘোলাটে সবুজ। পানির উপরটা একটু যেন চিকচিক করে, তেলতেলে ভাব। ছোট ছোট কয়েকটি জাহাজ ভিতরে ঢুকছে, পাশাপাশি সাম্পানও আছে। 'ওই পাড়ে কি?' রিয়ানা জিজ্ঞেস করে। ওই পাড়ে "'আনোয়ারা', চোরাচালানীদের স্বর্গ।" শরীফ বললো।

রিয়ানার এই প্রথম সমুদ্র দেখা। সামনের পাথরে ঢেউ আছড়ে পড়ে ফেনা তৈরি হয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে, ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সাম্পানগুলো মনে হয় এই বুঝি ডুবে গেলো। কিছুক্ষণ দেখা যায় না, আবার পরের ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বসে। যতদুর দেখা যায়, শুধু নীল জলরাশি। সূর্যটা এখনো বেশ উপরে। দিগন্তে কিছু সাদাটে মেঘ, বাকি পুরো আকাশ জমাট



নীল। সমুদ্রের বিশালতায় অভিভূত রিয়ানা কখন যে শরীফের হাত মুঠোয় নিয়েছে টের পায় নি। শরীফ হাত ছাড়িয়ে নেয় না। রিয়ানার হাতের উষ্ণতা ওর হাতে ছড়িয়ে পরে। রেড কিনের দেয়ালে বড় ঢেউ আছড়ে পওে জলকণার মেঘ তৈরি হয়। ওরা সেই মেঘে অবগাহন করে নিঃশব্দে। একসময় শরীফ বলে, 'চলো, বিচের দিকে যাই।' মাথা হেলান দিয়ে স্মিত হাসিতে সম্মতি জানায় রিয়ানা।

পতেঙ্গা বিচের কাছে বাঁধটিতে উঠতেই উচ্ছল হয়ে উঠে রিয়ানা, 'ও মা, এত সুন্দর!' একদিকে কয়েকটি টং ঘর বিভিন্ন পশরা সাজিয়ে বসেছে। অনেক ধরনের ছোট-বড় ঝিনুক, কড়ি, শুকিয়ে যাওয়া স্টার ফিশ, ঝিনুক দিয়ে বানানো মালা, মোমদানী, পাখি, আরও কত কি। দোকানী জানালো একটু সময় দিলে আমরা কড়িতে নাম লিখে দিতে পারি। "তাই! আচ্ছা, এই কড়িটিতে লিখেন 'আনা', যাওয়ার সময় নিয়ে যাব।"

ওরা দুজন হেঁটে ঢেউয়ের কাছে পৌঁছায়। রিয়ানা ওর স্যান্ডেল খুলে হাতে নিয়ে, সালওয়ার হাঁটুর নিচ পর্যন্ত গুটিয়ে আস্তে আস্তে জলের দিকে নামতে থাকে। ওর গোড়ালিতে ঢেউয়ের মাথার ফেনা এসে চুমু দিয়ে যায়। ও একহাতে ওই ফেনা তুলে নেয়, পিছন ফিরে ডাকে, 'আসো।' শরীফ রিয়ানার পাশে এসে দাঁড়ায়। জুতোর ভিতরে নোনা পানি, মোজা বালিতে ভরে গেছে, কিছুই শরীফকে ভাবায় না। রিয়ানা পিছন ফিরে হাতের স্যান্ডেল শুকনো বেলাভূমিতে ছুঁড়ে ফেলে শরীফের হাত মুঠোয় ভরে বলে, "আমাকে তুমি 'আনা' বলবে।"

অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে রিয়ানা অস্ফুটস্বরে বলে, 'আমি ...' আর বলতে পারে না। শরীফ রিয়ানার দিকে তাকিয়ে বললো, 'জানি, আমিও।' সূর্য দিগন্তে নেমে যাওয়া অবধি দু'জনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'তোমার জন্য অপেক্ষা করছিল হেমন্তের শেষ বিকেলের রোদ

কাঁপছিল আঘ্রাণের ধানের শীষে জমানো শিশির, অবশেষে
তুমি এলে জোছনার আড়িপাতা এক নিঝুম সন্ধ্যায়
নকশিকাঁথা ওমে... অতঃপর
কথা বলে, কাকচক্ষু জল
যুগল ভ্রূ'র পিঁয়াজ-কাজল আর
দশ দিগন্ত আলো করে আসে এতোটুকু হেম
আলো আঁধারিতে ভাসাই প্রথম প্রেমের ভেলা।' —জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ



## ১৩

পর্দা ভেদ করে সকালের সূর্যের আলোয় বেডরুম হালকা আলোকিত হয়েছে। ফাহমিদা অনেকবার এই পর্দা বদলাতে চেয়েছে। অন্ধকার না হলে ওর ঘুম ভাল হয় না। এবার পর্দা বদলাতে হবে, ফাহমিদাকে বলে বিকালে গুলশানের দিকে যাওয়া যায় কিনা হাসান ভাবলো। শনিবার সকালে ওরা একটু দেরী করে ঘুম থেকে উঠে।

সকালে আটটায় ভাইবার-এর মেসেজ স্ক্রিন আলোকিত হয়ে উঠলো। হাসান ওর স্ত্রীর হাতটি বুকের উপর থেকে সরিয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে ফোনটি হাতে নিয়ে দেখে টুনটুনির ম্যাসেজ, 'আজ কি ফ্রি আছেন? ভাবীকে বলে রাখেন। আমি দশটায় আপনাকে বনানী আড়ং-এর সামনে থেকে তুলে নিবো। আজ সারাদিন আমার সাথে থাকবেন।' কোনো অনুরোধ নয়, আদেশও নয়, যেন এটিই ঘটবে, এ চাওয়াতে ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশের সুযোগ নেই।

সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠতেই ফাহমিদা আধোঘুম জড়িত স্বরে মৃদু প্রতিবাদ জানালো, 'উম! উঠলে কেন?'

'জরুরী অফিসের কাজ আছে, আজ একটু দেরী হবে, গাড়ী রেখে যাচ্ছি, তুমি মায়ের বাসায় যেও। আমি রাত্রে নিয়ে আসবো।'

'ওই রুম থেকে অনামিকাকে আমার কাছে দিয়ে যাও। আর ময়নাকে বলো তোমাকে নাস্তা বানিয়ে দিবে।'

ফাহমিদার কপালে চুমু দিয়ে হাসান ওয়াশ রুমে গিয়ে ক্লিন শেভড হয়ে শাওয়ার নিয়ে কাপড় পরে নিলো। টুনটুনি পোশাকের একটু বিচ্যুতি হলে বলতে দ্বিধা করে না। অফ হোয়াইট চিনো, মার্ক স্পেন্সার এর কালো ফুল স্লিভ ড্রেস শার্ট, কেলভিন ক্লেইনের কালো বেল্ট, কালো ট্যাসেল লোফার আর কালো চামড়ার বেল্টের ঘড়িতে হাসানকে অসম্ভব সুপুরুষ লাগছে। বেরোবার আগে ডিওর-এর সউভেজ এর ছোঁয়া; ময়নাকে বললো দরজাটা টেনে দে।

একটা উবার নিয়ে পাঁচ মিনিটে আড়ং-এর সামনে পৌঁছে গেলো। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই টুনটুনি তার কালো টয়োটা ক্রাউন নিয়ে এসে

গেছে। হাসান সামনে বসতে গেলে টুনটুনি বাঁধা দেয়, পিছনে আসেন। হাসান গাড়ির বাম দিকটায় বসে। 'আপনাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে যেন কালো পদ্ম,' টুনটুনি অকপটে ব্যক্ত করে। হাসান এবার ভালো করে টুনটুনির দিকে তাকায়। কালো টিশার্ট, বুকের উপর এমবোস করে লিখা 'I am yours,' তার উপরে সাদা স্লিভলেস কটি, কালো হাই হিল জুতো, বরাবরের মত সাদা বড় ব্যাগ। বুকের লেখাটি হাসানকে একটু ভাবিয়ে তুলে, লেখাটি কি মানুষটিকে বুঝাচ্ছে, না কি? টুনটুনি হাসানের মনের দ্বন্দ্ব যেন বুঝে ফেলে। মেয়েদের এটি বুঝবার সহজাত ক্ষমতা আছে। হাসানের দিকে তাকিয়ে চোখ একটু সরু করে বলে, 'ইউ আর আ নটি বয়, কবির ইস্টার্ন হাউজিং চল।'

পল্লবী দিয়ে একটু ভিতরে বেড়ী বাঁধের ইস্টার্ন হাউজিং-এর দ্বিতীয় পর্বের কাজ চলছে। কিছু দালান দাঁড়িয়ে গেছে। বেশির ভাগই ছোট ছোট দেওয়াল ঘেরা প্লট। একটি বড় প্লটের ভিতরে অনেক লোক, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি তার পাশে এসে থামল। টুনটুনি বললো, 'আমরা এখানে নামবো।'

ভিতরে যেতেই কিছু লোক এসে সালাম দিলো টুনটুনিকে, বোধ করি স্পট বয়, লাইট অ্যাসিস্ট্যান্ট। দুটো প্লাস্টিকের চেয়ারে হাসান আর টুনটুনি পাশাপাশি বসলো। স্ট্যান্ডের উপর সাদা রিফ্লেক্টর লাগানো, একজন বুম ধরে দাঁড়িয়ে আছে, ট্রাই পডের উপরে ক্যামেরা বসানো তার পিছনে একজন মনে হয় ডিরেক্টর ফটোগ্রাফি, আর মনিটরের পিছনে ডিরেক্টর নিজেই। হাসান নিজের ধারনা থেকে বুঝে নিলো। কেননা এরই মধ্যে ডিরেক্টর চিৎকার করে বলে উঠেছেন, 'সাইলেন্স।' একটি ছেলে কিছু দূর থেকে দৌড়ে এলো, পিছনে আরও তিনজন ওকে ধাওয়া করছে। ওরা ওকে ধরে ফেলে ঝাঁপিয়ে পরে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিয়েছে। ডিরেক্টর বললেন, 'কাট।'

এবার টুনটুনি ওনার সাথে হাসানের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক হাসানের আপাদমস্তক দেখলেন, কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। স্পট বয়কে ডাক দিলেন, 'ওই ছ্যামড়া, ভাইরে চা দে।'



টুনটুনি ডিরেক্টরের একদম কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমাকে ভুলে গেলেন, আমি তো ডাক পেলাম না।' 'আপনার রোল তো এই সিনেমায় নাই, পরেরটায় দেখি, আছেন তো কিছুক্ষণ। ভাই রে নিয়া আইছেন, বসেন। ওই ফ্ল্যাটে একটা সিন আছে। এর পরে কথা কমুনে।' জানিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে গেলেন। স্পট বয় টুনটুনির কানে কানে এসে বললো, 'স্যার-এর সাথে পরে দেখা কইরেন।' হাসান শুনেও না শুনার ভান করলো।

গাড়িতে উঠে টুনটুনি জানালো যে, এই ডিরেক্টরের একটা নাটক 'কাল সূতোয় বোনা জাল'-এ কাজ করেছে, এটি তাঁর দ্বিতীয় চলচিত্র, একটু ভাব এসেছে। ডিরেক্টরের নির্লিপ্ততায় বিষণ্নতা ভর করেছে টুনটুনির স্বরে বুঝতে পারলো হাসান। হাসান হাত বাড়িয়ে টুনটুনির হাত মুঠোয় ভরে নিলো। 'চলুন, আজ আমরা দূরে কোথাও যাই,' বলে হাসান ড্রাইভারকে গাজীপুরের দিকে যেতে বলে। টুনটুনি পা সিটের উপরে উঠিয়ে বসলো, হাসানের কাঁধে মাথা রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। একসময় ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলো।

'ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে
এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা
যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্রনাচের তালে।
আসন আমার পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে
পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালো॥' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ১৪

টুনটুনির কথা:

শরীফের সাথে যখন আমার সম্পর্ক গাঢ় হলো তখন একসময় মনে হলো ওকে ছাড়া বাঁচবো না। একেকটা দিন যেন একেকটা বছর। তিন মাসের মাথায় শ্রাবণের এক মাঝ রাতে বৃষ্টিতে ভিজে আমি ওর বাসায় হাজির হলাম। ও তখন আগ্রাবাদ থাকে, ছোট্ট একটি বাসা। দুটো রুম আর রান্না ঘর। বাবা-মায়ের সাথে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। ওরা চান শরীফের সাথে যেন সম্পর্কটি থেকে সরে আসি। আমরা খ্রিস্টান আর ও মুসলমান। এই সম্পর্ক ওরা মেনে নিতে পারবেন না। আমি ছোট্ট একটি ব্যাগে আমার কয়টি কাপড় ভরে রিকশা ডেকে সোজা ওর বাসায়। দরজা খুলে শরীফ ভীষণ অবাক।

'তুমি?'

'হ্যাঁ, চলে এসেছি।'

থতমত করে শরীফ, 'মানে আমি এখন কি করবো, রাত হয়ে গেছে, এদিকে বৃষ্টি, কি যে করি।'

'তোমাকে কিছু এখন করতে হবে না। একটা শুকনো তোয়ালে বা গামছা দাও। আমি কাপড় বদলাবো। তুমি বাইরের রুমে বসো।'

আমি কাপড় বদলে ওর পাশে গিয়ে বসলাম। 'এত ভাবছো কেন? আমাকে খাওয়াতে পারবে না?'

শরীফ নড়েচড়ে উঠলো, 'পাগলী, কি যে বলো! কিন্তু আমি ভাবছি তোমার বাবা-মা চিন্তায় থাকবেন, আর আমি এখানে একা থাকি...'

'তো? কাল আমরা বিয়ে করবো। তুমি সকালে উঠে ব্যবস্থা করবে। এখন আমার ক্ষুধা লেগেছে, খেতে দাও।'

খেয়ে নিয়ে ওকে বললাম যে, 'আমার ঘুম পেয়েছে, ঘুমাবো; তুমি সামনের ঘরে সোফায় ঘুমাও।'



ও সুড়সুড় করে চলে গেলো, বালিশ পর্যন্ত নিলো না। আমি দরজা ভিজিয়ে দিলাম, ছিটকিনি আটকাই নি, সারারাত বসে থাকলাম, যদি শরীফ আসে। খুব চাইছিলাম যে শরীফ আসুক, আমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলুক, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমি আছি; শরীফ এলো না। খুব হালকা নাক ডাকার আওয়াজ মাঝে মাঝে পেলাম। ভোরের আযানের সাথে আমার চোখ লেগে এলো।

প্রায় দুপুরের কাছাকাছি সময়ে আমার ঘুম ভাঙলো। চোখ মেলে তাকালাম, অপিরিচিত পরিবেশ। একটু ভয় পেয়ে চাদর বুকে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করলাম। আবার চোখ খুলে সামনে তাকিয়ে দেখি দেওয়ালে শরীফের ছবি, মনে পড়লো কাল রাতের কথা। টিনের ছাদের পাকা বাড়ী, মাথার পিছনে কাঁচের জানালা, দেওয়ালে ঝাঁঝরি কাটা ভেন্টিলেটর, ডান দিকে ড্রেসিং টেবিলে শরীফের কিছু প্রসাধনী সামগ্রী, আর বামদিকে ওয়ারড্রব। উঠে বসে শরীফকে ডাকলাম। ও এলে বললাম, 'আমাকে একটু ধরে থাকো।' ও আমাকে জড়িয়ে ধরলে আমি ওর বুকে মাথা রেখে অনেকক্ষণ ওর বুকের ভিতরের আওয়াজ শুনলাম। শরীফ আমার ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এত মায়া লাগলো যে ওকে আরও জোড়ে জড়িয়ে ধরলাম। শরীফ বললো, 'আনা, সামনের ঘরে লিমন আর মৌমিতা আছে, তুমি রেডি হয়ে আসো।'

ড্রয়িং রুমে ওরা দুজনে সোফায় বসে গভীর চিন্তামগ্ন। আমি ওদের বললাম, 'তোরা যাই বলিস না কেন, আমি ফিরে যাচ্ছি না। আজ সন্ধ্যায় আমাদের বিয়ে হবে, আর নয়তো আমি এই বাড়ী ছেড়েও চলে যাবো।'

শরীফ ল্যান্ড ফোন থেকে ঢাকায় ওর বাসায় কথা বললো অনেকক্ষণ। ওরা এই বিয়েতে রাজী না। ও শেষমেশ রেগে ফোন ছেড়ে দিয়ে লিমন আর মৌমিতাকে বললো, 'আমি টাকা দিচ্ছি, ওর যা যা লাগে নিয়ে আসো, আজই বিয়ে হবে, আমি ব্যবস্থা করে আসি।'

'আমার কি যে আনন্দ হাসান, আপনাকে বোঝাতে পারবো না। ওরা সবাই বেরিয়ে গেলে, আমি সত্যি সত্যিই দুই পাক নেচে ফেললাম।'

বিকেলে ওরা ফিরে এলো। মৌমিতা খুব সুন্দর করে আমাকে সাজালো। 'জানেন হাসান, আমার বিয়েতে আমি লাল বেনারসী পড়েছি; শরীফ ওর চেনা জুয়েলারি দোকান থেকে কানের দুল, আংটি, নাকফুল, গলার গয়না সব এনেছে। আর কি চাওয়ার থাকতে পারে?'

"সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নয়টার দিকে কাজী সাহেব এলেন। আমি ভিতরের রুমে বিছানায় বসেছি, পাশে মৌমিতা আমার হাত ধরে আছে। আমার ভিতরটা কাঁপছে। শরীফের দুজন বন্ধু এসেছে আনোয়ার আর মাসুদ। ওর ছেলেবেলার বন্ধু, আমি চিনি। আমার সাথে দুষ্টুমি করে গেলো, আমি লজ্জায় লাল। যাহোক, কাজী সাহেব দোয়াদরুদ পড়া শুরু করলেন। একসময় তিনি ওর বন্ধু আর লিমনকে সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এই বিয়েতে আমি রাজী কিনা? আচ্ছা, হাসান, বলেনতো এটা কেমন প্রশ্ন? আমি ঘোমটার আড়াল থেকে অস্ফুট স্বরে বললাম, 'রাজী'। কাজী সাহেব বললেন, 'আবার বলেন।' আমি আবারও বললাম। এভাবে তিনবার বলার পরে তিনি বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ।' এরপরে ড্রইং রুমে গিয়ে মোনাজাত পড়ালেন।"

কথায় কথায় গাড়ি অনেকটা পথ এসেছে। বিকেল গড়িয়েছে, রোদ নরম হয়েছে, হাসান ভাবলো এবার ফেরা যায়। টুনটুনিকে জিজ্ঞেস করতে জানালো যে এখন বাসায় যাবে না, ঢাকার দিকে গাড়ি ফিরে যাক। টুনটুনি হাসানের ডান হাত জড়িয়ে ধরে আরো কাছে এসে বসলো। কনুইয়ের কাছে নরম স্পর্শে হাসান অস্বস্তি অনুভব করছিলো। বাঁয়ে আস্তে সরে গেলে টুনটুনি আরো জড়িয়ে ধরে হাসানের ডান কাঁধে মাথা নামিয়ে চোখ মুদে থাকলো। বাকিটা পথ নিঃশব্দে কেটে গেলো।

টঙ্গীর কাছাকাছি আসার পর টুনটুনি বললো, 'আপনার না এক বন্ধু থাকে উত্তরায়, ওখানে চলুন।'

'দেখি ও আছে কিনা, আপনি দুপুরে কিছু খান নি, আমরা কি কোথাও খেয়ে নিবো?'

'না, সামনে হেল্‌ভেসিয়া থেকে কিছু নিয়ে নেন, ওতেই হবে।'



হাসানের বন্ধু মাহমুদ দক্ষিণবঙ্গের ব্যস্ত ব্যবসায়ী, ঢাকায় পৈতৃক সূত্রে একটি দোতলা বাড়ী পেয়েছে, একতলায় অফিস আর দোতলায় ও থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যশোর থাকে। একদম সিঁড়ির গোঁড়া থেকে ওদেরকে উপরে নিয়ে গেলো।

'আপনি আসাতে ভীষণ খুশী হয়েছি, রিয়ানা। হাসান আপনার কথা প্রায়ই বলে; কি সৌভাগ্য আমার আজ দেখা হলো।'

'কি যে বলেন! আপনার বন্ধুর সময়ই হয় না', টুনটুনির অনুযোগ।

'আমার মিটিং আছে, ক্লায়েন্ট আসবে, নিচে যাচ্ছি। আপনারা গল্প করেন, আমরা পরে একসাথে ডিনার করবো', বলে মাহমুদ নিচে নেমে গেলো।

হাসান টুনটুনিকে পাশের কক্ষে নিয়ে গেলো, বেশ পরিপাটী করে গুছিয়ে রাখা, একটি দুই আসনের সোফা, সোফার সামনে ছোটো কাঁচের টিপয়, একটা কুইন সাইজ বিছানা, দুই পাশে বেডসাইড টেবিল; একটিতে টেবিল ল্যাম্প, অন্যটিতে এক বোতল মিনারেল ওয়াটার আর দুটো পানির গ্লাস। টুনটুনি ঢাউস ব্যাগটি সোফাতে ছুড়ে ফেলে বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বললো, 'আপনি টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে টিউব লাইট বন্ধ করে দিন, আমি ফ্রেশ হয়ে আসি।'

হাসান সোফায় বসে ভাবছে একজন মানুষের জীবনে কত কিছু ঘটে যায়, কতটুকুই বা আমরা জানি আর কতটুকুই বা বুঝি। টুনটুনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে হাসানের পাশে বসে বললো, 'আমাকে খাইয়ে দিবেন?' হাসান তটস্থ হয়ে খাবারের প্যাকেট খুলে একটু চিকেন খুলে টুনটুনির মুখে পুরে দিলো।

টুনটুনি হাসানের বাম হাত জড়িয়ে ধরে ওর ঘাড়ে মাথা রেখে বলতে শুরু করলো, "রাত প্রায় এগারোটার দিকে সবাই চলে গেলো। বাসায় শুধু আমি আর শরীফ, আমি বিছানায় লাল বেনারসি পরে অপেক্ষা করছি শরীফ কখন আসবে। কিছুক্ষণ পর ও এসে বললো, 'আজ সারাদিন অনেক ধকল গেলো, তুমি শুয়ে পড়ো।' ও দরজাটি ভিজিয়ে দিয়ে ড্রয়িং রুমে বসে সিগারেট টানতে থাকলো, আমি লাল

বেনারসি পরে সারারাত বসে থাকলাম, একসময় দেখলাম ঐ রুমের আলো নিভে গেলো। আমি ওর অপেক্ষায় থাকলাম...”

টুনটুনি ফিসফিস করে বললো, ‘আমাকে একটু আদর করবেন?’ ওর গাল বেয়ে অশ্রুর বন্যা। হাসান দু’হাতে ওর চোখের জল মুছে নিলো, আলতো করে টুনটুনির দু’চোখে চুমু দিয়ে, ওর ঠোঁটের উপর ঠোঁট নামিয়ে আনলো। চোখের জলে আর্দ্র হয়ে আছে টুনটুনির নরম উষ্ণ ঠোঁট। টুনটুনি প্রবল আবেগে হাসানকে দু’হাতে জড়িয়ে ধরলো, কান্নায় ওর সারা শরীর কাঁপছে।

‘কেউ জানে না একেকটি মানুষ বুকের মধ্যে কী গভীর দীর্ঘশ্বাস
নিয়ে বেড়ায়—
কোনো বিষণ্ণ ক্যাসেটেও এতো বেদনার সংগ্রহ নেই আর,
এই বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাসের পর
দীর্ঘশ্বাস যেন একখানি অন্তহীন
প্রগাঢ় এপিক!
পাতায় পাতায় চোখের জল
সেখানে লিপিবদ্ধ
আর মনোবেদনা সেই এপিকের ট্রাজিক মলাট;
মানুষের বুকে এতো দীর্ঘশ্বাস,
এতো দীর্ঘশ্বাস, কে জানতো!’ —মহাদেব সাহা



## ১৫

টুনটুনির কথা:

রিয়ানা তার বুকের নিচে হাঁটু ভাঁজ করে বিছানায় বসে, খাটের মাথার পাশে পিঠ ঠেকিয়ে বিশ্রাম নেয়। তার তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। তার পিরিয়ডের সময় সে মাঝে মাঝে এরকম কষ্ট পায়। সে তার পাশে ঘুমিয়ে থাকা স্বামীকে শান্তভাবে ধাক্কা দেয়। সে জাগে না। তার চুলে হাত রেখে আদর করে এবং খুব নিচু স্বরে ডাকে, ‘শরীফ... শরীফ।’ সে বিরক্তির সুরে জবাব দেয়, ‘কি?’

‘খুব বেশি ব্যথা হচ্ছে। আমি সহ্য করতে পারছি না। দয়া করে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলো,’ রিয়ানা মিনতি করে।

‘বাইরে ঝড় উঠছে। আমি কিভাবে তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব, এহ্! আমার গাড়ি নেই। একটি প্যারাসিটামল খাও। ব্যথা কমে যাবে। আমরা কাল সকালে যাবো,’ শরীফ তার দিকে না ফিরে বলে শান্তির ঘুমে ফিরে যায়।

ঘর অন্ধকার হয়ে আসছে। সে নিজেকে বিছানার মাঝখানে টেনে নেয়। শরীফের পায়ের নিচ থেকে সুন্দরভাবে ভাঁজ করা সুতির চাদর তুলে নেয়। রিয়ানা চাদরটি শরীফের গায়ের উপর বিছিয়ে দেয়। শরীফ উপলব্ধি করে এবং আরামসূচক সাড়া দিয়ে অনুমোদন করে। রিয়ানা পাশ থেকে তার মুখের দিকে তাকায়। সে শুধুমাত্র মুখের রূপরেখা দেখতে পারে। রিয়ানা তার পাশের পর্দাটা একটু সরিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। এটা সূর্যাস্তের ঠিক আগের মুহূর্ত। সূর্য নেই। আকাশ বিভিন্ন শেডে ধূসর। বাতাসেরা গান গেয়ে থেমে গেছে। এমনকি রাতের বেলায় ফোঁটা জুঁই গাছের পাতাও থেমে গেছে। সে দূর থেকে জিউসের হাসি শুনতে পায়। প্রথমে, রাতে প্রস্ফুটিত জুঁই থেকে একটি পাপড়ি জলের ফোঁটার সাথে চলে যায়। এটা তার জন্য খুব ভারী বোঝা। তারপর দুই, তিন... তারা ওপর থেকে নামতে থাকে। সে তার গণনা হারিয়েছে।

টিনের ছাদে বৃষ্টির ফোঁটা যেন গান গাইছে। আর জিউস গর্জন করে। একটি অসম্ভব উজ্জ্বল আলো খোলা মাঠের তাল গাছে আঘাত করে। সে তার ব্যথায় ভীত ছিল, জিউস-এর রাগ প্রকাশ করাতে সে ভয় পেয়েছে। সে শরীফকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু জিউসের ক্রোধ এবং তাদের টিনের ছাদে বৃষ্টির কোলাহলের মধ্যে শরীফ তার শান্ত ঘুমে নিমজ্জিত। ঘরটা অন্ধকার। সে মরতে ভয় পায়, এবং খুব একা বোধ করে, এমন অনুভূতি যা তার সাথে বছরের পর বছর ধরে থাকবে। দূর কোণে ঘর-টিকটিকির ডাক হিমশীতল। সে কাঁপছে, পর্দা ফেলে দেয়। রিয়ানা গোমেজ তার বুকে ক্রস আঁকলো, বিছানায় বসে তার হাঁটু শক্ত করে ধরে রাখে।

সে শরীফের দিকে মুখ করে হাঁটুতে মাথা রাখে। তার গাল আর চিবুক বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তার কামিজের উপরের হেমলাইনটি চোখের জলে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। অশ্রুর ফোঁটা তার স্তনের মাঝে গড়িয়ে পড়ে, তার সমতল পেট জুড়ে, বর্ষার নদীর মতো বয়ে যাওয়ার আগে নাভিতে কিছুক্ষণ থেমে থাকে। সে প্রার্থনা করতে থাকে—

'তিনি তাদের চোখ থেকে সমস্ত অশ্রু মুছে দেবেন, এবং মৃত্যু আর থাকবে না, শোক, কান্না বা ব্যথা আর থাকবে না, কারণ আগের জিনিসগুলি চলে গেছে।' —রিভিলেশন ২১:৪



## ১৬

'মনে মনে বহুদূর চলে গেছি যেখান থেকে ফিরতে হলে আরো
একবার জন্মাতে হয়
জন্মেই হাঁটতে হয়
হাঁটতে-হাঁটতে হাঁটতে-হাঁটতে
একসময় যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে পৌঁছুতে পারি
পথ তো একটা নয়
তবু, সবগুলোই ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে শুরু আর শেষের কাছে বাঁধা
নদীর দু'প্রান্তের মূল
একপ্রান্তে জনপদ অন্যপ্রান্ত জনশূন্য
দুদিকেই কূল, দুদিকেই এপার-ওপার, আসা-যাওয়া, টানাপোরেন
দুটো জন্মই লাগে
মনে মনে দুটো জন্মই লাগে' —শক্তি চট্টোপাধ্যায়

হাসান অফিসে বসে খুব গভীর ভাবে ভাবছে; টুনটুনি উল্কাপিণ্ডের মতন যেন ওর বুকে আছড়ে পড়েছে। ক'মাস আগেও যাকে চিনতো না, কখনো কথা হয়নি, দেখা হয়নি তাঁর জন্য হাসান চৈত্রের দাবদাহে চৌচির মাঠ যেমন বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে, হাসান তেমনি টুনটুনির ফোনের অপেক্ষায় থাকে। অফিসে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে, এমনকি বাসায় ফিরে গভীর রাতে যখন ভাইবারে আলো জ্বলে উঠে তখন সন্তর্পণে ফাহমিদার পাশ থেকে উঠে ড্রয়িং রুমে গিয়ে কথা বলে। একদিন ফাহমিদা আপত্তি তুলেছিলো, 'এত রাতে কার সাথে কথা বলো?' বিদেশী প্রিন্সিপাল-এর সাথে কথা বলছি বলে বিষয়টি তখনকার মতো সামলে নেয়।

ওকি ফাহমিদার প্রতি অন্যায় করছে? আজকাল বাড়ী ফিরতে হাসানের মাঝেমাঝেই দেরী হয়। আগে সন্ধ্যা সাতটা-আটটার মধ্যেই ফিরে যেত, কদাচিৎ দেরী হয়েছে। এখন সপ্তাহে দুই তিনদিন রাত এগারোটা বারোটা বেজে যায়। ফাহমিদা আর ওদের মেয়ে অনামিকা ওর জন্যে অপেক্ষা করে, একসাথে খাবে। হাসান যখন ফোন করে জানায় যে ওর দেরী হবে, ফাহমিদা প্রশ্ন করে না। ছোট্ট করে বলে,

'আচ্ছা'। ওই ছোট্ট শব্দের পিছনে দীর্ঘশ্বাসটি অনুভব করে হাসান। এটিও বুঝে ওরা একদিন প্রশ্ন করবে, টুনটুনির অমোঘ আকর্ষণ ওই চিত্র হাসানের সামনে আসতে দেয় না।

টুনটুনির জন্য হাসান এক ধরনের দুর্বলতা অনুভব করে, ওরা কি বন্ধু, না কি তার চেয়ে বেশী কিছু? মোহ না কি হৃদয়ের টান? ওর কি টুনটুনির জন্য কেবল শারীরিক দুর্বলতা? যদি সেটা হয় তাহলে মন কেনো উচাটন থাকে? হাসান আনমনা হয়ে ভাবে আর টেবিলে রাখা সাদা কাগজে আঁকিবুঁকি কাটে। দরজায় টোকার শব্দে হাসান সম্বিত ফিরে পায়, সাদা কাগজটিতে বেশ কয়েকবার লেখা 'টুনটুনি'। ও লজ্জিত হয়ে কাগজটি উল্টে রেখে বলে, 'আসুন'।

হাসানের ম্যানেজার ভিতরে ঢুকে জানালেন, 'স্যার, আপনার কালকের ফ্লাইট কনফার্ম হয়েছে। এই যে ই-টিকেট প্রিন্ট করেছি। রেডিসন ইস্তাম্বুল সুলতান আহমেত হোটেলে বুকিং দেওয়া আছে। আপনার পছন্দ অনুযায়ী ওরা সমুদ্রের দিকে রুম দিয়েছে, তিনদিনের পেমেন্ট করে দিয়েছি। চেক আউটের সময় অ্যাডজাস্ট করে দিলে হবে।'

হাসানের ম্যানেজার খুব গোছালো মানুষ। সাধারণত কোন বিষয় তাঁর চোখ এড়ায় না। 'তাহলে, আমি আজ আগেই চলে যাই, আপনাকে এয়ারপোর্ট যেতে হবে না, ইসমাইল ভোর তিনটায় আমার বাসায় থাকবে,' হাসান ম্যানেজারকে জানিয়ে দিলো। ম্যানেজার সালাম দিয়ে নিজের ডেস্কে চলে গেলেন। হাসান ফোনটি হাতে নিয়ে ভাবছে কল দিবে কি দিবে না। ভাবতে ভাবতেই মেসেজ অপশনে পেন্ডিং মেসেজে টুনটুনির আনরেড মেসেজে চোখ পরলো, 'ফ্রি আছেন, কল দিবো?' ঘন্টাখানেক আগেই দিয়েছে।

হাসান টুনটুনিকে কল দিতেই ও একবারেই ফোন ধরে অভিমানের সুরে বলতে লাগলো, 'আমাকে আপনার মনেই পরে না, সেই কখন জানতে চাইলাম ফ্রি আছেন কিনা? জানালেন না। আমার কথা বলতে ইচ্ছে করলে কি করবো বলেন তো? আপনার সাথে তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কথা বলা যায় না, দেখা তো অনেক দূরের বিষয়।'



টুনটুনি একটু দম নেওয়ার জন্য থামতেই হাসান বললো, 'সরি, ব্যস্ত ছিলাম, ফোন দেখিনি; টুনটুনি আমি কাল ভোরে দেশের বাইরে যাচ্ছি।'

ফোনের ওপাশে একদম নিঃশব্দ, কেউ আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। নিঃশ্বাসের শব্দে বুঝলো টুনটুনি আছে। অনেকক্ষণ পর বললো, 'আপনার সাথে আমার দেখা হবে না?'

'হবে।'

'কিভাবে? আমি তো শুটিংয়ে যাচ্ছি, পূর্বাচল। বারোটার দিকে শেষ হবে।'

'আচ্ছা, আপনি যান। আমি দশটার কাছাকাছি সময়ে আপনাকে কল দিয়ে স্পটটি কোথায় জেনে নিবো।'

'ওকে, যাই রেডি হই, বাই।'

## ১৭

হাসান দুপুরের একটু পরেই বাসায় ফিরে এলো। ময়না দরজা খুলে দিতেই ভিতর থেকে ফাহমিদা জিজ্ঞেস করলো, 'কে এসেছে?' 'খালু আসছেন', বলে ময়না ভিতরে চলে গেলো। 'ও মা, বাবা তুমি আসছো', দৌড়ে এসে অনামিকা হাসানকে জড়িয়ে ধরলো। হাসান মেয়েকে আদর করে বললো, 'দাঁড়ারে মা, কাপড় ছেড়ে আসি।'

'কাপড় চেঞ্জ কোরো না, যমুনা ফিউচার পার্কে যাব, তোমার মেয়ের জন্য জুতো কিনতে হবে,' ফাহমিদা জানালো।

'হমম, যাবো, তবে জুতো কিনতে নয়, ঘুরতে। ওর জুতো আমি টার্কি থেকে এনে দেবো।'

'তো, টার্কি যাচ্ছো কবে আর কত দিন থাকবে?'

'কাল ভোরে, তিন দিন।'

'সত্যি, বাবা, আমার জন্য দুটো জুতা আনবে, একটা লাল আর একটা কালো,' অনামিকা আবদার জানালো।

'অবশ্যই মা, তুই তো আমার একমাত্র মেয়ে!'

'হয়েছে, ওকে আর আহ্লাদ দিতে হবে না।'

যমুনা ফিউচার পার্কের বিশালতায় হাসান সবসময় হিমসিম খায়। ওর কাছে এই মলটি একটি গোলকধাঁধা। সেন্টার কোর্ট, সাউথ কোর্ট, নর্থ কোর্ট, ইস্ট কোর্ট, ওয়েস্ট কোর্ট এই সব ওর কাছে ওলটপালট মনে হয়। অনামিকা বাবার অসহায়ত্বে খিলখিল করে হাসে, 'বাবা, তোমাকে কিছু খুঁজতে হবে না, মা সব জানে।' সত্যি সত্যি ফাহমিদা ওর আর মেয়ের যা প্রয়োজন সেগুলো ঠিকই খুঁজে কিনে ফেললো। হাসান বাধ্যগত স্বামী হয়ে মেয়ের হাত ধরে পিছনে পিছনে হাঁটতে থাকলো।

চারদিকের ঝলমলে আলোয় শপিংয়ে ব্যস্ত সেজেগুজে আসা ললনারা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পিছনে পিছনে হাঁটছে ঘর্মাক্ত ও তটস্থ



পুরুষ, স্বামী কিংবা বাবা; কেবল ছেলেবন্ধুদেরই একটু পাশে দেখা যায়, বান্ধবীদের মন জয় করা আর ধরে রাখার কঠিন কাজটি প্রাণপণে করে যাচ্ছে, বেচারারা। কেনাকাটা শেষে ফুড কোর্ট হয়ে বাসায় ফিরে দ্রুত সুটকেস গুছিয়ে নিলো হাসান। একাজটি ও নিজেই করে। চার দিনের কাপড়-চোপড়, শেভিং কিটস, দুই জোড়া ফরমাল শু, আর ওর প্রিয় হারুকি মুরাকামির বই 'কাফকা অন দ্যা শোর'। ফাহমিদাকে বললো, 'আমাকে একটু আগে বেরোতে হবে, লা মেরিডিয়েনে ডেলিগেটদের সাথে মিটিং সেরে সরাসরি এয়ারপোর্টে যাবো।'

'তাই বলে এত আগে,' বিস্মিত ফাহমিদা।

'হমম, মিটিং শেষ হতে রাত একটা বেজে যাবে, তখন বাসায় ফিরে আবারো আড়াইটায় বেরোতে হবে। এত রাতে তোমাদের ঘুম নষ্ট করতে চাই না। এক ঘন্টা হোটেল লবিতে কাটিয়ে দিবো।'

'যেতে হবে যাও।'

হাসান ফাহমিদার অন্ধকার হয়ে আসা মুখ দেখে বুঝলো ওর কথাগুলো ফাহমিদা মেনে নিতে পারে নি। দরজার কাছে এসে মেয়েকে চুমু খেয়ে ফাহমিদাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে ওর আড়ষ্টতা টের পেলো, চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলো বিষণ্ণতা আর গভীর অনিশ্চয়তার ছাপ। নারীরা বোধ করি ওদের তৃতীয় নয়নে অমঙ্গল আগেই বুঝতে পারে।

অপরাধবোধ আর টুনটুনির কাছে যাওয়ার উত্তেজনার এক দোদুল্যমান অনুভূতি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো হাসান।

১৮

রাত নয়টায় রওনা দিয়ে পনেরো মিনিটেই টঙ্গী ফ্লাইওভারে পৌঁছে গেলো, এয়ারপোর্ট মোড় আর হাউজবিল্ডিং মোড়ে কিছুটা সময় লেগেছে। হাসান টুনটুনিকে ফোন দিয়ে জানালো যে ফ্লাইওভারে আছে এখন।

'চলে আসেন সোজা, মাজুখান বাজারে এসে শুটিং বাড়ী বললে দেখিয়ে দিবে। আমার একটা সিন আছে, দশটায় প্যাক-আপ হয়ে যাবে, রাখছি মেকআপ নিবো।'

অন্ধকার রাস্তার বুক চিরে হেডলাইটের আলোয় উড়ে আসা পতঙ্গের আত্মাহুতি। মাঝে মাঝে দূরের কোনো বাড়ীর উঠোনে স্বল্প আলোর হলুদ বৈদ্যুতিক বাতি। অসীম ঘুচঘুচে কালো আকাশে তারার মেলা। দূরের উত্তর আকাশে ভালুকের মতো দেখতে লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল। ড্রাগনের মত ড্রাকো তারকামণ্ডলী চিনতে পেরেছে হাসান। ওদের পাশে বেশ বড় আরেকটা তারকামণ্ডলী নজরে এলো। নামটা বিদঘুটে ওই মুহূর্তে মনে পড়লো না; সব মিলিয়ে হাসানের নিজেকে নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী মনে হলো। অল্প সময়েই ওর এই নিঃসঙ্গতা কেটে গেলো। ছোট্ট বাজারের মধ্য দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে। চায়ের দোকানে জটলা করে টেলিভিশন দেখায় মগ্ন বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা। কারো হাতে ছোট কাঁচের চায়ের মগ, কেউ বা বিড়ি ধরিয়ে সুখটানে বিভোর। বাজার পেরোতেই আবারো নিকষ কালো পথ। মিনিট পাঁচেক পরেই মাজুখান বাজারে পৌঁছে জিজ্ঞেস করতে বাজারের ভিতরে বাঁয়ের কাঁচা পথ দেখিয়ে দিলো। কয়েক'শ গজ পরে দেওয়াল ঘেরা বাংলোর সামনে পৌঁছালো।

টুনটুনি বাইরে এসে নিয়ে গেলো। ভিতরে অনেক আলো। বেশ কয়েকজন আঙ্গিনার কোনায় আড্ডারত। টুনটুনি হাসানকে ওই আড্ডার কাছে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলো, 'হাসান সাহেব, আমার পারিবারিক বন্ধু, আর ইনি আহমেদ বণিক আমাকে অনেক স্নেহ করেন।'

হাসান করমর্দনের জন্য হাত বাড়াতেই আহমেদ দু'হাতে তার হাত ধরে বললেন, 'খুবই ভালো লাগছে যে, আপনি কষ্ট করে আমাদের



কাজ দেখতে এসেছেন। সবাই তো হলে ছবি দেখে কিন্তু এর পিছনে কি পরিশ্রম তা তো জানে না। আর রিয়ানা একটু বেশিই বলেছে; আমরা সিনিয়ররা যদি ওদের সাপোর্ট না করি তাহলে ওরা কাজ দেখাবে কি করে?'

'আমি যদিও হলে অনেকদিন যাই না, তবে আপনার প্রশংসা শুনেছি, আপনি গত বছর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন,' হাসান আন্তরিকভাবে বললো।

'না রে ভাই, নেগেটিভে রোলে অভিনয় করি বলে পাবলিক মনে করে আমরাও বোধ হয় ওই রকমই,' আহমেদ সাহেব খেদোক্তি করলেন। হাসান নীরব থাকলো, ইন্ডাস্ট্রিতে ওনার কাস্টিং কাউচ নিয়ে রসালো গল্প চালু আছে।

টুনটুনি হাসানের নীরবতা উপলব্ধি করে বললো, 'আপনারা গল্প করেন, আমি যাই, এখনই আমার পালা।'

'আমি দেখবো না,' হাসানের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, আসেন। পাঁচ মিনিট গল্প করে আসেন,' এর মধ্যে 'টেক'-এর জন্য তৈরি হয়ে যাবো।

গল্প আর জমলো না। হাসান সিগারেট প্যাকেট বের করে ওনাকে অফার করলো আর নিজেও একটা ধরালো। নীরবে দুই জগতের দুই পুরুষ ধূমপান করতে থাকলো।

বাংলোর ভিতরে একটি রুমে শুটিং চলছে; মধ্য বয়স্ক এক সময়ের নায়ক বিছানায় শুয়ে আছে, রিয়ানা তাঁর বক্ষ লগ্না হয়ে কি যেন বলছে। কয়েকবার সিনটি রি-টেক হলো, পরিচালকের পছন্দ হয়নি। তাঁর অসন্তুষ্টি কার প্রতি রিয়ানা না কি ওই পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই নায়ক, হাসান বুঝতে পারলো না। চারবারের বার পরিচালক সন্তুষ্ট হয়ে প্যাক আপের নির্দেশ দিলেন।

শুটিং বাড়ী থেকে বেরিয়ে ওদের গাড়ী টঙ্গীর পথে চলছে। রাত আরো গভীর হয়ে এসেছে, মাজুখান বাজারের একটি চায়ের দোকান

ছাড়া বাকী সবগুলোই বন্ধ হয়ে গেছে। বাজার পেরিয়ে আসার পর 'আমি খুব ক্লান্ত, একটু শুয়ে পরি,' বলে টুনটুনি দুই পা সীটে উঠিয়ে পা মুড়ি দিয়ে হাসানের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো। হাসান অপ্রস্তুত ও বিব্রত হয়ে বললো, 'আচ্ছা, ঠিক আছে,' নিজের হাতদুটো কোথায় রাখবে বুঝে উঠছে না। শেষ পর্যন্ত বাম হাতটিকে শুয়ে থাকা রিয়ানার বাম বাহুর উপর আলতো করে রাখলো, আঙুল সংকুচিত করে যাতে ওর স্পর্শ অযাচিত মনে না হয়। রিয়ানা বললো, 'আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিবেন, একটু ঘুমাই।' ওর ঘন চুলের ভিতরে আঙুল চালানো প্রায় দুঃসাধ্য কাজ। হাসান আস্তে আস্তে কোঁকড়ানো লালচে চুলের উপরেই সস্নেহে হাত বুলাচ্ছে। গাড়ীর হেডলাইটের আলো ছাড়া আর কোনো আলো নেই। নিজেকে এখন আর নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী মনে হচ্ছে না। একসময় নিজের ভিতরে উষ্ণতা অনুভব করে লজ্জিত হলো, নড়েচড়ে বসতে গেলো যাতে টুনটুনি টের না পায়। টুনটুনি ঘুমোয় নি এখনো, ফিসফিস করে বললো, 'ডোন্ট ওরি এবাউট ইট, আই উইল টেক কেয়ার অব ইট আফটার ইউ কাম ব্যাক ফ্রম টার্কি, রিল্যাক্স, লেট ইট স্লিপ।' নিজের শরীরের এই আচরণে স্তম্ভিত এবং বিব্রত হাসান জানালা দিয়ে দূর আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। একদিকে ওর ভিতরে হিমশীতল অনুভূতি হচ্ছে, অন্যদিকে পিঠ ঘেমে গেছে। কিছুক্ষণ পর টুনটুনির গাঢ় নিঃশ্বাস টের পেলো। ঘুমের মধ্যেই হাসানের বাম হাত নিজের মুঠোয় ধরে পেটের কাছটায় রেখেছে। হাসানের ভিতরের টানটান ভাবটি ধীরে ধীরে শিথিল হয়েছে। ওর নিজেরই তন্দ্রার ভাব এসেছে, চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

হঠাৎ করেই গাড়ী ব্রেক করাতে হাসানের তন্দ্রা ছুটে গেলো। ড্রাইভার জানালো যে, সামনে ট্রাক উল্টে রাস্তা বন্ধ, দু'পাশেই অনেক গাড়ী জমে গেছে, ওর ভাষায় 'মহা জ্যাম লাগছে।'

'স্যার, ঘুরায়া সাতপোয়া, হারবাইদ, লালাদরিয়া দিয়া টঙ্গী যাওন যাইব; তয় রাস্তা চিপা, রাইতের বেলা তো সমস্যা হইত না, দুইটার আগেই পৌছায় যামু।'

'আচ্ছা, যাও,' হাসান সম্মতি দেয়।



টুনটুনি উঠে বসে কি হয়েছে জানতে চাইলে হাসান বললো, 'সামনে দুর্ঘটনা ঘটেছে, এগোনো যাবে না, গ্রামের ভিতর দিয়ে ঘুরপথে যাচ্ছি।'

টুনটুনি সামনের সিটের পিছন থেকে পানির বোতল নিয়ে এক ঢোক খেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'খাবেন, মুখ লাগাইনি?' 'সমস্যা নেই,' জানিয়ে হাসান পানির বোতলটি নিয়ে একটু খেয়ে সিটের পিছনে রেখে দিলো। টুনটুনি ওর বাঁ হাত জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রাখলো। খুব স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক আচরণ মেয়েটির, কোনও জড়তা নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'আমার চট্টগ্রামের কথা খুব মনে পড়ছে।'

## ১৯

টুনটুনির কথা:

আমার বিয়ের পর প্রায় এক বছর আমরা চট্টগ্রামের ওই একই বাসায় ছিলাম। বিয়ের রাতে তো শরীফ কাছেই ঘেঁষলো না। পরপর দু'দিন ড্রয়িং রুমে সোফায় ঘুমাতো। তৃতীয় রাত্রে আর আমি ওকে যেতে দিলাম না। পাশাপাশি দু'জন শুয়ে আছি, যেন দু'টি শবদেহ পরে আছে বিছানার উপর। ভীষণ কষ্ট হতো, আমাকে বিয়ে করে ও কি অনুতপ্ত? আমার ধর্ম নিয়ে কি ও বিব্রত? আমি আমার পরিবার ছেড়ে ওর কাছে এসেছি। আমার যে আর কেউ নেই! তবুও আমি ওকে প্রশ্ন করি নি। আমি চেয়েছি যে শরীফ নিজে থেকেই আমাকে কাছে টেনে নিক। দিন সাতেক পর এক রাতে শরীফ আমাকে বুকে টেনে নিল। সেই রাতের প্রতিটি মুহূর্ত আমার এখনও মনে আছে। ওর প্রতিটি ছোঁয়া বিথোফেনের সপ্তম সুরের মতন কখনও টানটান উত্তেজনা, আবার কখনও ধীর লয়ে আমার শরীরের অনুতে অনুতে সুর তুলছে—অবর্ণনীয় আনন্দের লহরী। প্রথম প্রবেশ আনন্দদায়ক না হলেও একসময় সয়ে এলো। জীবনের ওই প্রথম অসম্ভব সুন্দর মুহূর্ত কি ভুলতে পারি!

হাসান, এরপরও কেন জানি শরীফকে খুব দূরের মানুষ মনে হতো। কখনও কখনও আমাকে ভীষণ আনন্দের চূড়ায় নিয়ে গেছে, আবার অবহেলায় ছুঁয়েও দেখেনি। নিজে থেকে যখন কাছে টানতে চেয়েছি, কিংবা ওর বুকে মাথা রেখে শুতে চেয়েছি খুব বিরক্ত হয়েছে। অভিমানে, দুঃখে-কষ্টে উল্টো দিক ফিরে শুয়ে থাকতাম। আমার চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে, কাউকে বলতে পারি নি! আমি যে সবাইকে ছেড়ে এসেছি, কাকে বলবো?

আমি রান্না করতে জানতাম না, এক বুয়া আসতো সকালে, সব কাজ করে বিকালে যেত। ওর কাছে আমি রান্না শিখি। প্রথম প্রথম ব্যাঁকা-ত্যারা পরোটা বানিয়েছি, রুটি পুরে গেছে, সবজিতে নুন বেশী হয়েছে। শরীফ সেটাই খেয়ে অফিসে গেছে, কখনও অভিযোগ করে নি। এর মধ্যেও আমার আনন্দ ছিল। আস্তে আস্তে অনেক রান্নাই শিখে



ফেললাম। দুপুরে শরীফের জন্য টেবিল সাজিয়ে বসে আছি, ওর অফিসে ল্যান্ডফোনে ফোন করেছি, কখনও পেয়েছি কখনও পাই নি। ওর সহকারি অনেক ক্ষেত্রেই ফোন ধরে বলতেন যে, 'স্যার তো সিটে নাই, পরিদর্শনে গেছেন, তদন্তে গেছেন,' ইত্যাদি ইত্যাদি। আর পেলেও আসতে চাইতো না, অনুনয় বিনয় করলে হয়তো মাঝে মাঝে আসতো। সারাটি দিন একা কাটিয়েছি। জানালার পাশের হাসনাহেনা আর দেওয়ালের পাশের নারকেল গাছটি আমার কথা বলার সাথী।

মাস তিনেক যাওয়ার পর আমি ওকে বললাম যে, থিয়েটারে তো সদস্যা হয়েছিলাম সেখানে যাই আমার যে সময় কাটে না। তুমি না হয় অফিস থেকে ফেরার সময় আমাকে নিয়ে আসবে। শরীফ রাজি হয়ে গেলো। হয়তোবা দুপুরে বাড়ী আসার তাড়া দিবো না, কিংবা ওর কাজের ব্যাঘাত ঘটবে না, কি জানি, কিন্তু ও রাজি হলো। হাসান টুনটুনির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে, আর কখনও ড্রাইভারকে গুগল ম্যাপ দেখে রাস্তা বাতলে দিচ্ছে।

থিয়েটারে যাওয়ার পর থেকে আমার সময়টা একটু বদলে গেলো। শুরুতে অনুশীলনের সময় সিনিয়র আর্টিস্টদের চা বানানো, পাণ্ডুলিপি এগিয়ে দেওয়া, ড্রেস পরতে সাহায্য করা এগুলোই করেছি। দু'মাস এভাবেই কেটেছে আমার। একদিন একটি নাটকে দলীয় নৃত্যে সুযোগ পেলাম। আমি ভীষণ পরিশ্রম করেছি, ছন্দে যেন ভুল না হয়, স্টেপিং যেন ঠিক মতো হয়, বাসায় এসেও চর্চা করেছি। ডিসেম্বর-এর তৃতীয় সপ্তাহ জুড়ে জেলা শিল্পকলা মঞ্চে নাটকটি মঞ্চস্থ হলো। আমি সেই প্রথম পেশাদার শিল্পী হিসেবে মঞ্চে উঠলাম। যদিও আমাদের সম্মানী ছিল না। মাঝে মাঝে দলের ডিরেক্টর স্যার সাদা খাম ধরিয়ে দিতেন। যাই দিতেন পরম শ্রদ্ধা ভরে নিয়েছি। এভাবেই আমার অভিনয় জগতে যাত্রা শুরু।

'আজ থাক, অনেক কথা বলেছেন, আপনি ক্লান্ত, বিশ্রাম নিন, আমরা প্রায় কাছাকাছি আছি,' হাসান বললো।

'হুম, এখন তো দুটো বাজে, আপনি তিনটায় ডিপারচার লাউঞ্জ ঢুকবেন। তাহলে আমি ওই পর্যন্ত আপনার সাথে থাকি। আপনার

ড্রাইভার আমাকে বাসায় নামিয়ে দিবে,' টুনটুনি অনুরোধ করে। হাসান ড্রাইভারকে পার্কিং-এ রেখে রেস্টুরেন্টে খেয়ে আসতে বললো।

তিনটা পর্যন্ত ওরা হাত ধরে গাড়ীতে বসে থাকলো। ওই ভোরে অনেক যাত্রী, মধ্যপ্রাচ্যে কাজের জন্য যাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে টুনটুনি হাসানের সাথে ডিপারচার লাউঞ্জের গেটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো, 'আমাকে ভুলে যাবেন না তো?' হাসান টুনটুনির মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, 'কাঁদবেন না, হাসুন, এভাবে কাঁদলে আমি যাবো কেমন করে? আমি প্রতিদিন ফোন করবো।'

টুনটুনি যতক্ষণ দেখা যায় অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। ওর ভিতরে হাসানের জন্য অদ্ভুত মায়া আর হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে। টুনটুনি ভাবছে ওকি হাসানকে ভালোবেসে ফেলেছে।

'তোমায় ভালোবেসেছি আমি, তাই
শিশির হয়ে থাকতে যে ভয় পাই,
তোমার কলে জলের বিন্দু পেতে
চাই যে তোমার মধ্যে মিশে যেতে
শরীর যেমন মনের সঙ্গে মেশে।' —জীবনানন্দ দাশ



## ২০

হাসান টার্কিশ এয়ারলাইন্সের এয়ারবাস ৩৩০-৩০০তে প্রবেশ করে সুন্দরী এয়ারহোস্টেসের মোহনীয় হাসিতে সাড়া দিয়ে বোর্ডিং পাসটি বাড়িয়ে ধরাতে জানালো যে, ইকোনোমি কেবিনের মাঝামাঝি জানালার দিকে ওর আসন। হাসান আসনটি খুঁজে পেয়ে হ্যান্ড লাগেজ উপরে উঠিয়ে নিজের আসনে বসে প্রথমেই ফাহমিদাকে ফোন করলো, ফাহমিদা এক রিংয়েই সাড়া দিলো।

'ঘুমোও নি এখনো?'

'না, তুমি ছাড়া তো কখনও থাকিনি, ঘুম আসছে না।'

'আমি প্লেনে উঠেছি, আর কিছুক্ষণ পর ছাড়বে। অনামিকা ঘুমিয়েছে?'

"হ্যাঁ, ছোট মানুষ, কতক্ষণ জেগে থাকবে, বললো, 'বাবার সাথে কথা বলবো', আমি জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।"

'তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো।'

'নিজের দিকে খেয়াল রেখো, আর নেমেই ফোন দিও।'

'আচ্ছা, দিবো, আল্লাহ হাফেজ।' হাসান ফোনটি রাখলো। কিছুক্ষণ ভেবে টুনটুনির নাম্বারে ফোন করলো ফোন ব্যস্ত, কল ওয়েটিংয়ে আছে। ও ভ্রূ কুঁচকে ফোনটির দিকে তাকালো, এতো ভোরে ব্যস্ত, এই না বাসায় গেলো! এক মিনিট পরে টুনটুনির কল, 'সরি, ডিরেক্টর কল করেছিলেন, পরের শুটিং-এর শিডিউল জানাচ্ছিলেন।'

'ওহ্, তাই! আমি উঠেছি, একটু পরে ছাড়বে, ভাবলাম বাই জানাই, ভাল থাকবেন।'

'আপনিও ভাল থাকবেন, হ্যাভ এ সেফ জার্নি, কল করবেন।'

'ওকে, বাই।'

কল শেষ করে এয়ারহোস্টেস এলেনার (এর মধ্যে নেমপ্লেট পড়ে নিয়েছে) কাছ থেকে এক গ্লাস পানি চাইলো। 'ঠাণ্ডা না কি রুম টেম্পারেচার, স্টিল ওয়াটার না স্পার্কলিং ওয়াটার,' শুধালো এলেনা।

'আপনি যা দিবেন তাই অমৃত সমান,' ইংরেজিতে বললো হাসান। স্মিত হেসে চলে গেলো এয়ারহোস্টেস।

হাসান টুনটুনির নাম্বারে আবারো কল করলো, এবারো ব্যস্ত, কল ইন ওয়েটিং। বিস্মিত হয়ে ফোনের দিকে তাকিয়ে রইলো। এলেনার কাছে থেকে পানির গ্লাসটি নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে কল কেটে দিয়ে ছোট ছোট চুমুকে পানি পান করে ট্রে-তে রেখে চুপ হয়ে বসে থাকলো। এর মধ্যে সেফটি রুলস নিয়ে ভিডিও শুরু হয়েছে। আরেকজন স্টুয়ার্ড লাইফ জ্যাকেট হাতে নিয়ে দেখাচ্ছে। কোন যাত্রীর সেদিকে মনোযোগ নেই। মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত সবাই। ওর ফোনটির কম্পনে তাকিয়ে দেখলো টুনটুনির কল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলো, সাড়া দিলো না। একটু পরে ক্ষুদে বার্তা, 'সরি।' হাসান ফোন বন্ধ করে হাত ব্যাগে রেখে দিলো।

হাসান চারদিকে তাকিয়ে যাত্রীদের দেখছে, বেশ কিছু তরুণ-তরুণী সম্ভবত ছুটি শেষে ইউরোপের কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাচ্ছে। এক হিপ্পি জুটি গভীর চুম্বনরত। ওর সামনের আসনে মা তার ছোট শিশুকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছেন। এলেনা কাছে এসে মাকে জানালেন যে, ইকোনোমির প্রথম সারিতে বেবী সিট দেওয়া যাবে। মা বললেন, 'সমস্যা নেই।' এখানেই ভালো আছেন। এর মধ্যে বিমান বেশ উপরে উঠে এসেছে। হাসান এয়ারফোনের প্যাকেট খুলে কানে লাগিয়ে ইন-ফ্লাইট মুভির তালিকা থেকে ওর একটা প্রিয় ছবি মরগান ফ্রিম্যান অভিনীত 'বাকেট লিস্ট' চালিয়ে দিলো। অসাধারণ ছবি, মৃত্যু পথযাত্রী দুই বন্ধুর জীবনের অভিলাষ, পূরণ করতে না পারা ইচ্ছাগুলোর তালিকা এবং একে একে সেগুলো পূরণ করা, ভীষণ মানবিক আর হৃদয়স্পর্শী।

ছবি দেখতে দেখতে রাতের খাবার এলো। হাসান টার্কিশ খাবার খুব পছন্দ করে; কালো জলপাই, মেটে রঙের জলপাই, পনির, শসা আর টমেটো সালাদ, টার্কিশ ডোনের কাবাব, গ্রিল্ড বেগুন, গ্রিল্ড



টমেটো, ফ্রাইড রাইস, কয়েক ধরনের বনরুটি আর বাটার, সাথে এসরটেড ফ্রুটস ও চকলেট মউস। হাসান এক গ্লাস রেড ওয়াইন চেয়ে নিলো। খাবারের স্বাদ আর গন্ধ হাসানের ভিতরে প্রবেশ করলো, খুব তৃপ্তি নিয়ে খাবার শেষ করে অল্প অল্প চুমুকে রেডওয়াইন পান করে ট্রে-টি ফেরত দিলো। এলেনা জিজ্ঞেস করাতে জানালো, 'অসাধারণ, ধন্যবাদ।'

এরপর ছবিটি শেষ করে ঘুমের জগতে চলে গেলো। কাল মিটিং আছে, এই বিশ্রামটি প্রয়োজন। স্টুয়ার্ডের ডাকে ঘুম ভাঙলো, 'হোয়াট উড ইউ লাইক টু হ্যাভ ইন ইউওর লাঞ্চ, মিট ওর ফিশ?'

'ফিশ প্লিজ,' হাসান ওর মতামত জানিয়ে ওয়াশ রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ফিরে এলো। ঘন্টা দেড়েক বাকি আছে।

ফ্লাইট সময়মত ল্যান্ড করেছে, ইমিগ্রেশন পেরিয়ে এয়ারপোর্টের ওয়াইফাই ব্যবহার করে ফাহমিদাকে ভাইবারে কল দিয়ে জানালো যে, ঠিক মতো পৌঁছে গেছে। অনামিকার সাথে কথা বললো। দুজনকেই খুব মিস করছে মন বিষণ্ন হয়ে গেলো। বিশাল, ঝলমলে এয়ারপোর্ট, সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা। চারদিকে সুবেশী হন্তদন্ত যাত্রী কোন কিছুই হাসানকে ছুঁয়ে গেলো না। বিষণ্ন চিত্তে ট্রলি ঠেলে আগমন ফটক দিয়ে বেরিয়ে এলো।

## ২১

হাসান মর্মর সাগরের পাশে কেনেডি সড়কে রেডিসন সুলতান আহমেত হোটেলে চেক-ইন করে ওর পছন্দের রুমটি পেলো। দোতলায়, দক্ষিণে আর পূর্ব দিকে গভীর নীল জলরাশি। পূর্বদিকে আঙ্কারা নজরে পরে, বসফোরাসের ঐ পাড়েই বোধ করি আঙ্কারার হায়দারপাশা এলাকা। হাসান সুটকেস আর কেবিন লাগেজ রুমে রেখে বারান্দায় চলে এলো। সাদা রঙ করা কাঠের রেলিং, বাইরের দিকে টবে নাম না জানা লাল-হলুদ ফুলের ঝাড়, কমলা গোলাপের ফুলদানীসহ ছোটো সাদা মারবেল পাথরের টেবিল, কাঠের চেয়ার। চেয়ারে বসে সে একটা সিগারেট ধরালো। বিকেল ছয়টায় মিটিং, এই অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে আছে।

অথৈ জলের বুকচিরে বিশাল জাহাজের সারি, তেলবাহী জাহাজ, মালবাহী জাহাজ, বিলাস তরী, কিছু মাছ ধরার ট্রলারও চোখে পরলো। বসফরাস প্রণালীর পরে ব্ল্যাক সি পেরোলেই ইউক্রেনের ওডেসা বন্দর। মালবাহী জাহাজগুলো হয়তো ওই দিকেই ছুটছে। সমুদ্রে নোনা হাওয়ার একটা আলাদা গন্ধ আছে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ধূমপান করে একসময় ফোনটি হাতে নিলো। ভাইবারে একটা মিসকল, টুনটুনির।

কলব্যাক করলো, ব্যস্ত; আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ধুয়োর বলয় বানিয়ে উপরের দিকে ছাড়ছে আর দেখছে কিভাবে সেটি বাতাসে মিলিয়ে যায়। হাতের আঙ্গুলে তাপ লাগতে সম্বিত ফিরে পেলো। আবার ভাইবারে কল করলো, ঢাকায় তখন মধ্য দুপুর; এবার সংযোগ সফল হল।

'হ্যালো, কেমন আছেন? কখন পৌছালেন? আমি আপনাকে ঢাকা এয়ারপোর্টে কল দিয়েছি, আবার ঘন্টা খানেক আগেও কল দিয়েছি, পেলাম না যে? রাগ করেছেন?' টুনটুনির একরাশ প্রশ্ন।

ঢাকার প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলো হাসান, জানালো এই তো একটু আগেই হোটেলে উঠেছে, কল দিয়েছিলো, ব্যস্ত থাকায় সংযোগ হয় নি।



হাসানের কণ্ঠের শীতলতা টের পেয়ে টুনটুনি খুব নরম সুরে বললো, 'আমরা শিল্পী মানুষ, কাজ করে খেতে হয়। অনেক লোকের সাথে ইচ্ছা না থাকলেও কথা বলতে হয়। ফোন না ধরলে হয়তো পরের নাটকে বা সিনেমায় ডাকবেই না।'

'ইট'স ওকে, আপনি ব্যস্ত শিল্পী, এটা হতেই পারে, কেমন আছেন?'

'ভালো, আপনার সাথে কথা বলতে পেরে বেশ ভালো লাগছে।'

টুকটাক কথা হতে হতে একসময় জড়তা কেটে কথাগুলো ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছলো। সুতোর টানটান ভাবটি চলে গেছে, ঘুড়ি এখন মুক্ত আকাশে উড়ছে।

'আপনাকে খুব মিস করছি।'

'তাই, আমিও,' হাসান তার অনুভূতি জানালো।

'তা হলে ভিডিও কল দেন, আপনাকে দেখি।'

'বাসায় কেউ নেই? কি ভাববে?'

'আমি এ ঘরে একা, মেয়ে ওই ঘরে ঘুমাচ্ছে। তা ছাড়া আমি কার সাথে কথা বলি সেটা নিয়ে কাউকে জবাবদিহি তো আমি করি না।'

ভাইবার ভিডিও অন করে টুনটুনিকে দেখতে পেলো, বিছানায় আধশোয়া, কানে ইয়ারফোন, ফোনটি একটু দূরে ধরাতে সম্পূর্ণ মুখ, গলা, হাতাবিহীন সাদা নিটের গেঞ্জি পরে আছে, গেঞ্জিটির সামনের অংশ অনেকখানি উন্মুক্ত। বাম হাতের চাপে একপাশ ফুলে আছে, মাঝে খাদে স্বর্ণের চেইনে লকেট বামের স্ফীত অংশে যেন অবহেলায় শুয়ে আছে।

'লকেটটি সুন্দর,' হাসান বললো।

টুনটুনি ডান হাতে লকেট তুলে দেখালো, 'এটি রাজহাঁস।'

'আপনার রাজহাঁস ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ, ধবধবে সাদা রাজহাঁস আমার খুব প্রিয়। আপনার শুধু রাজহাঁস চোখে পড়লো, আর কিছু ভালো লাগে নি?'

'না, মানে, সব কি বলা যায়?' হাসান ইতস্তত আর বিব্রত বোধ করে উত্তর দিলো। একই সাথে নিজের পৌরুষত্ব জেগে উঠছে টের পেয়ে বললো, 'আপনাকে সমুদ্র দেখাই?'

'হ্যাঁ, দেখান, আপনাকে কিন্তু একদম লাল পদ্মের মতো লাগছে,' টুনটুনি অবলীলায় জানালো।

হাসান এর মধ্যে ওর জার্নির কাল পোলো শার্ট বদলে কলারে কালো পাইপিং দেওয়া লাল পোলো পরে নিয়েছে। টুনটুনির প্রশংসায় কিঞ্চিত লজ্জা পেয়েছে ও।

'আচ্ছা, আর বলতে হবে না, ধন্যবাদ। ওই সামনে যে সাগরটি দেখছেন ওটি মর্মর সাগর। আর এ পাশে বসফরাস প্রণালী, প্রণালীর ওই পাড়ে টার্কির মূলভূমি আঙ্কারা।'

'ও মা, কি সুন্দর, আমাকে নিয়ে যাবেন?'

'শরীফ ভাই যেতে দিলে অবশ্যই নিয়ে আসবো।'

'আমি চাইলে ও কখনো না করবে না,' টুনটুনি দৃঢ়ভাবে জানালো।

এভাবেই খুনসুটি আর সমুদ্র দেখে অনেকখানি সময় গড়িয়ে গেলো। হাসান বললো, 'এবার রাখি, আমার মিটিং আছে, রেডি হতে হবে।'

'ঠিক আছে, রাতে কল করবেন, ভালো থাকবেন, বাই।'



## ২২

বিকালে সাড়ে পাঁচটায় লবিতে নেমে এক পাশে বসে কফির অনুরোধ জানিয়ে ওর প্রিন্সিপাল রাফসান মেহমেতের জন্য অপেক্ষা করছে। ঠিক ছয়টায় প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ, কাঁচা-পাকা চুল, লম্বা নাকের এক সুপুরুষ ওর সামনে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমি রাফসান মেহমেত।' হাসান উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করে আসন গ্রহণের অনুরোধ জানালো।

হাসান: কি খাবেন? কফি? সাথে কিছু বলবো?

মেহমেত: না, কফিই ঠিক আছে, আর কিছু লাগবে না। আপনার ফ্লাইট কেমন ছিল?

হাসান: টার্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট সবসময় ভালো আর এই হোটেলটি চমৎকার।

মেহমেত: চলুন কফি পান করতে করতে আমরা প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করি।

মেহমেত ওর ব্যাগ খুলে প্রোডাক্ট ব্রশিউর বের করে হাসানকে অনেকগুলো বিভিন্ন মডেল এবং ক্যাপাসিটির সাবমারসিবল ওয়াটার পাম্প দেখিয়ে গুনাগুন বর্ণনা করলো। দীর্ঘ আলোচনার পর দুজনে দুটি মডেলের মূল্য আর সংখ্যা নিয়ে একমত হলো। হাসান জানালো, মঙ্গলবার সকালে মেহমেতের কারখানা পরিদর্শন করবে। মেহমেত কাল সকালে ওকে ইস্তাম্বুল ঘুরে দেখাতে চাইলে হাসান বিনীতভাবে প্রত্যাখান করে জানালো যে, ওর একা ঘুরতে সমস্যা হবে না। মেহমেতকে বিদায় জানিয়ে রুমে এসে ফাহমিদাকে কল করলো, ঢাকায় রাত হয়ে এসেছে। ফাহমিদা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো ঠিক মতো খাচ্ছো তো, হোটেলের পরিবেশ কেমন, মিটিং কেমন হলো। হাসান ওকে আশ্বস্ত করে বললো যে, ও ভালো আছে, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। ফাহমিদা অভিযোগ করলো, 'তোমার মেয়ে আমার কথা শুনে না, একদিন তুমি নেই তাতেই ও বেয়াদব হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, অনামিকাকে দাও।'

মায়ের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, মায়ের কাছ থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে বলতে শুরু করলো, 'বাবা, তুমি জানো আমি মাছ খেতে পারি না, মা আমাকে জোর করে মাছ খাওয়াবে। তুমি বল, মুরগী খেলে কি হয়?'

'মা রে, সব খেতে হয়, সব সময় কি মুরগী খাওয়া যায়! মায়ের কথা শুনিস, দুষ্টুমি করিস না, লক্ষ্মী মা আমার।'

'বাবা, তুমিও মায়ের হয়েই কথা বললে, যাও তোমার সাথে কথা বলবো না,' অনামিকা অভিমান করে মায়ের হাতে ফোন তুলে দিয়ে টেলিভিশনের সামনে টার্কিশ সিরিয়াল 'সুলতান মাহমুদ' দেখতে বসে গেলো। এতক্ষণ মা-মেয়ে তাই দেখছিল।

ফাহমিদার সাথে আর কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন রেখে দিয়ে হাসান বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো, টাকসিম স্কয়ার যাবে।

হোটেলের কাছ থেকেই মেট্রোতে চেপে খুব তাড়াতাড়ি টাকসিম স্কয়ারে পৌছে গেলো। স্কয়ারটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে ইতালিয় ভাস্কর পিয়েত্রো ক্যানোনিকার তৈরি 'রিপাবলিক মনুমেন্ট'। এই স্কয়ারটি সময়ের পরিক্রমায় অনেক আন্দোলনের, অনেক প্রতিবাদের সাক্ষ্য বহন করে। এখনও এর বিভিন্ন কোনায় সশস্ত্র পুলিশ জলকামান নিয়ে সতর্ক থাকে। এর চারদিকে সাজানো হোটেল, শুঁড়িখানা, রেস্টুরেন্ট, ফুড চেইন কি নেই! অনেক পর্যটক ক্যামেরা নিয়ে ভ্রমণের স্বাক্ষর রাখায় মনোনিবেশ করেছে। এক চৈনিক যুগল ওকে দেখে এগিয়ে এলো, 'ক্যান ইউ হেল্প আস প্লিজ?' ওদের বাড়িয়ে দেওয়া সেল ফোনে মনুমেন্ট-এর সামনে যুগলের বেশ কয়েকটি ছবি তুলে দিলে ওরা আকর্ণ বিস্তৃত হাসি দিয়ে বলল, 'সিসে, ওহ! স্যরি, থ্যাংক ইউ।' হাসান হেসে বললো, 'বুকাইসে (ইউ আর ওয়েলকাম)।'

'ও, ও, ইউ নো চাইনিজ!' বিস্মিত চৈনিক দম্পতি।

'নো, নো, আই নো অনলি ফিউ ওয়ার্ডস,' হাসান জানালো। 'এনজয় ইউর ট্রিপ, বাই,' জানিয়ে হাসান শপিং স্ট্রীট-এর দিকে হাঁটতে শুরু করলো। এ পথটির দু'পাশে সেরা ব্র্যান্ডগুলোর দোকানে থরে থরে পণ্য সাজিয়ে রাখা, ডিজেল, কেল্ভিন ক্লেইন, এডিডাস, নাইকি, টমি



হিলফিগার; অনেক টার্কিশ ব্র্যান্ডও নজরে এলো ইপেকিওল, ডি ফ্যাক্টো, এলসি ওয়াইকিকি, কলেজিও, বেশির ভাগই ওর কাছে অপরিচিত। দোকানে ঘুরতে ঘুরতে ফাহমিদার জন্য অফ হোয়াইট কার্ডিগান আর মেয়ের জুতো দু'জোড়া কিনে ফেললো। ফাহমিদা ওর জন্য কাপড়চোপড় কিনতে নিষেধ করেছে। হাসান জানে ওর প্রিয় কি, কাল যাবে সেখানে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে অনেকটা সময় গড়িয়েছে। আশপাশে ম্যাকডোনাল্ডস, পিজ্জাহাট, কেএফসি থাকার পরেও হাসানের মন টানলো না। কাছে কোথা থেকে যেন খাবারের মঁ মঁ গন্ধে ওর জিভে জল এসে যাচ্ছে। মেট্রো স্টেশনের দিকে একটু যেতেই খাবারের ফেরিওয়ালা দেখতে পেলো। দুটি মিদ্যে দোলমাসি (ঝিনুকের ভিতরে হারবড রাইস, কিশমিশ, পাইন নাট) আর একটি দুরুম (মূলত টার্কিশ শর্মা) কিনে নিল। লেবুর এক ফালি মিদ্যে দোলমাসি তে চিপে দিয়ে খেতে অসাধারণ লাগলো। হোটেলে ফিরে এলো প্রায় এগারোটার দিকে।

বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে হাফ প্যান্ট আর সান্ডো গেঞ্জি পরে মিনিবার থেকে টার্কির জনপ্রিয় বিয়ার 'ইফেস পিলসেন'-এর একটি ঠাণ্ডা ক্যান নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলো। রাতের আঁধারে মর্মর সাগরে বিলাসতরীগুলো হীরকের মত জ্বলজ্বল করছে। উত্তরের পরিষ্কার আকাশে বৃহৎ সপ্তর্ষিমণ্ডল খুব উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে। ফোনের ভাইবারের কম্পনে তাকিয়ে দেখে স্ক্রিনে টুনটুনির ক্ষুদে বার্তা, 'ভুলে গেছেন?'

হাসান সাড়া দিলো, 'হাই, কি খবর?'

'জেগে আছি একজনের জন্য, সে তো খবরও নিলো না।'

'খানিক আগেই ফিরেছি, বারান্দায় বসে বিয়ার পান করছি আর অন্ধকার সমুদ্র দেখছি।'

'কবি হয়ে গেলেন ওখানে গিয়ে! বিয়ার বেশী খাবেন না, ভুড়ি হয়ে যাবে, আমি ভুড়িওয়ালাদের একদম দেখতে পারি না, আর ভিডিও কল দেন, লিখতে কষ্ট হয়।'

হাসান রুমে ঢুকে ভিডিও কল অন করলো, টুনটুনি শুয়ে আছে, পাশে ওর মেয়ে ঘুমিয়ে। 'কথা বললে আপনার মেয়ের ঘুম ভেঙে যাবে না,' হাসান জিজ্ঞেস করলো। 'ড্রইং রুমে যাচ্ছি, এক মিনিট,' টুনটুনির উত্তর।

বারগ্যান্ডি রঙের সিল্ক নাইটি পরে আছে, মেকআপ ছাড়া বেশ সতেজ লাগছে ওকে। সুন্দর লাগছে জানাতেই ঠোঁট উল্টে বললো, 'শুধুই সুন্দর।'

কোথায় যেন বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে! হাসান বুঝে উঠতে পারছে না, কতটুকু বলবে, কোথায় থামবে, কোথায় গিয়ে গড়াবে এই কথোপকথন। ড্রইং রুমের কালো সোফায় বারগ্যান্ডি রঙের সিল্ক নাইটিতে টুনটুনির আধশোয়া হয়ে থাকা, হাসানের ভিতর উষ্ণতা জাগিয়ে তুললো। ও বলেই ফেললো, 'অসম্ভব আকর্ষণীয় লাগছে!'

'আর? চুমু খেতে ইচ্ছে করছে না?'

এবার হাসান স্তম্ভিত এবং অসহায়ত্ব অনুভব করলো। আস্তে করে বললো, 'আমি ভারচুয়াল জিনিসে বিশ্বাসী নই।'

'আসলটা যখন কাছে নেই, তখন ভারচুয়ালে আপত্তি কেন?'

এভাবেই কথার পিঠে কথা গড়াতে গড়াতে অনেকটা সময় গেলো। দেওয়াল ভাঙা না ভাঙার দোলাচলে অস্পস্ট হয়ে থাকলো হাসান।

টেবিল ঘড়িতে তখন দুটো বাজে। 'আপনার কথা বলছিলেন এয়ারপোর্টে আসার সময় ওই কথাগুলো বলেন, আমার শুনতে ইচ্ছে করছে,' হাসান প্রসঙ্গ বদলাতে চাইলো।

টুনটুনি বলল, 'আজ থাক, আপনি জার্নি করে নিশ্চয়ই ক্লান্ত, কাল বলবো।'

'ওকে, ভালো থাকবেন, বাই।' হাসান সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলো। বাথরুমে গিয়ে নিজের শরীরের উষ্ণতাকে সাড়া দিয়ে স্বমেহনে মগ্ন হলো।



বিছানায় ফিরে এসে অনেকক্ষণ নির্ঘুম চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো হাসান।

'এতো সহজেই ভালোবেসে ফেলি কেন!
বুঝি না আমার রক্তে কি আছে নেশা—
দেবদারু-চুলে উদাসী বাতাস মেখে
স্বপ্নের চোখে অনিদ্রা লিখি আমি,
কোন বেদনার
বেনোজলে ভাসি সারাটি স্নিগ্ধ রাত?
সহজেই আমি ভালোবেসে ফেলি,
সহজে ভুলি না কিছু—
না-বলা কথায় তন্ত্রে তনুতে পুড়ি,
যেন লাল ঘুড়ি একটু বাতাস পেয়ে
উড়াই নিজেকে আকাশের পাশাপাশি।' —রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

## ২৩

হাসান ঘুম ভেঙে যখন উঠলো তখন নয়টা বাজে। দশটার পরে সকালের নাস্তা পাওয়া যাবে না। বাথরুমে দাঁত ব্রাশ করতে করতে দিনের ছকটি এঁকে ফেলেছে। প্রথমেই আজ তোপকাপি প্রাসাদে যাবে, এরপর মিসরীয় বাজার (Misir Carsisi) হয়ে গ্র্যান্ড বাজার যাবে। যদি সন্ধ্যায় সময় হয় তাহলে বসফরাসের সান্ধ্যকালীন নৌ ভ্রমণে যাবে। মেটে রঙের গ্যাবার্ডিনের চিনোর সাথে ঘন নীল রঙের পোলো শার্ট পরে নিলো, কালো নাইকি কেডসটি হাঁটাহাঁটির জন্য বেশ আরামদায়ক, সাথে ছোট হ্যান্ড ব্যাগে পাসপোর্ট, ডলার, সানগ্লাস নিয়ে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে নিচের মারমারা ক্যাফেতে নেমে এলো।

ক্যাফেটি অর্ধ-চন্দ্রাকার, ভিতরের বৃত্তচাপ ঘিরে সবধরনের ব্রেকফাস্ট সাজানো—টার্কিশ, ইংলিশ, চাইনিজ এমনকি ভারতীয়; বাইরের বৃত্তচাপটি সমুদ্রের দিকে। হাসান এক গ্লাস কমলার রস, দুটি ব্রেড টোস্ট, মাখন, ব্ল্যাক কুরেন্ট জেলি, আর বিশাল ডিমের অমলেট নিয়ে বাইরের দিকে একটি টেবিলে বসলো। এখান থেকে বাইরের দৃশ্য চমৎকার। নিজের প্লেট শেষ করে আর এক প্লেট তাজা ফল নিয়ে এলো। এর মধ্যে সুন্দরী তরুণী ওয়েট্রেস কফি জাগ নিয়ে এসে শুধালো, 'কফি নেবে?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ। তুমি কি আমাকে এই গাইডম্যাপটি বুঝতে সাহায্য করবে?'

'অবশ্যই, তুমি কোথায় যেতে চাও?'

'আমি তোপকাপি প্রাসাদ জাদুঘরে যাবো।'

'এটি অবশ্যই দেখবে তুমি, হোটেল বেরিয়ে বাঁয়ে যাবে আহিরকাপি সড়ক ধরে বড় বড় হোটেল আরমাদা, ফোর সিজন্স বামে রেখে মিনিট দশেক হাঁটলেই তৃতীয় সুলতান মাহমুদ ফাউন্টেন দেখতে পাবে। ওর থেকে একটু এগুলেই প্রাসাদের ফটক নজরে পড়বে। যাওয়ার পথে ঐতিহাসিক নীল মসজিদ, সময় থাকলে দেখে যেতে পার।' মিষ্টি হেসে মেয়েটি বুঝিয়ে দিলো।



'অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে।'

'তোমার ভ্রমণ শুভ হোক,' বলে মেয়েটি পরের টেবিলে চলে গেল।

হাসান কফি শেষ করে মেয়েটির নির্দেশনা অনুযায়ী হাঁটতে থাকলো। কোনো ধরনের বিপত্তি ছাড়াই নীল মসজিদের সামনে পৌঁছলো। ষোল শতাব্দীর শুরুতে প্রথম সুলতান মেহমেত-এর সময়ে এটি নির্মিত হয়। একটি বড় গম্বুজ আর ছয়টি মিনার, অপরূপ নীলচে পাথরে তৈরি, ভিতরের কারুকার্য অসাধারণ। বেশীক্ষণ সময় ব্যয় না করে আবার হেঁটে রওনা দিলো প্রাসাদের উদ্দেশে। তোপকাপি দেখে অবশ্যই ওকে গ্র্যান্ড বাজারে যেতে হবে, আজ বোধ হয় বসফরাস ট্রিপ হবে না, ভাবছে হাসান।

তোপকাপি প্রাসাদ জাদুঘরে যখন ঢুকতে পারলো তখন প্রায় বারোটা বেজে গেছে। বিশাল লাইনের পিছনে পরে গেছে, একটু দ্রুত দেখতে হবে, হোটেলে বসে গাইড বইটি দেখে নিয়েছে। কিছু শর্টকাট করলে মোটামুটি ভালো ভাবে দেখে সন্ধ্যার আগে গ্র্যান্ড বাজারে যেতে পারবে।

সুলতান মেহমেতের কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের মধ্য দিয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের উত্থান। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই ওই সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে আধুনিক তুরস্কের যাত্রা।

তোপকাপি প্রাসাদ অটোমান সুলতানদের মূল বাসস্থান আর প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। স্তরে স্তরে সাজানো প্রাসাদটি, রাজকীয় ফটক, প্রথম উঠোন (ফার্স্ট কোর্ট ইয়ার্ড), দ্বিতীয় উঠোন (সেকেন্ড কোর্ট ইয়ার্ড), তৃতীয় উঠোন (থার্ড কোর্ট ইয়ার্ড), রাজকীয় রন্ধনশালা, রাজকীয় সভা, হেরেম, জাস্টিস টাওয়ার, রাজকীয় কোষাগার সবকিছু দেখতে গেলে একটি দিন পুরো দরকার। বাইজেন্টাইন এবং অটোমান সাম্রাজ্যের অনেক নিদর্শন এখানে সংরক্ষিত।

যেখানে সুলতান সাধারণ দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ দিতেন, অভিযোগ শুনতেন, প্রতিকারের নির্দেশ দিতেন সেটি অসম্ভব সুন্দর মার্বেল আর রঙিন টাইলস-এ মোড়া, ছাঁদ ও দেওয়াল মূল্যবান পাথরখচিত।

বিভিন্ন কক্ষে সুলতানদের পরিধেয় বস্ত্র, ব্যবহৃত অস্ত্র সংরক্ষিত আছে। বোধকরি এই প্রাসাদেই সবচেয়ে বড় পোরসেলিনের সংগ্রহশালা আছে। রাজকীয় রন্ধনশালায় একসাথে চার হাজার লোকের রান্না হতো। এলাহি কাণ্ড!

হাসানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে 'তোপকাপি ড্যাগার' যেটি প্রথম সুলতান মেহমেত তৈরি করিয়েছিলেন পারস্যের নাদির শাহ-এর জন্য; দুর্ভাগ্যক্রমে এটি হস্তান্তরের আগেই নাদির শাহ বিদ্রোহে নিহত হন।

প্রিভি চেম্বারে রক্ষিত হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর বস্ত্র, দু'টি ছুড়ি, ধনুক, দাঁত আর দাড়ির কিয়দংশ যা হাসানকে আবেগ আপ্লুত করলো। ও শ্রদ্ধাবনত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

তোপকাপি থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন বিকেল গড়িয়েছে, ক্ষুধা লেগেছে। বাইরে এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে দু'টি দুরুম (টার্কিশ শর্মা) আর এক বোতল মিনারেল ওয়াটার কিনে খেয়ে নিলো। ঘুরে বেড়াবার সময় বেশী খেতে হাসান পছন্দ করে না।

এবার আর দেরী না করে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা গ্র্যান্ড বাজার। অসাধারণ পণ্যের পশরা সাজিয়ে দোকানগুলো পর্যটকদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে। হাসান ফাহমিদার পছন্দ জানে, তাই সরাসরি জুয়েলারির দোকানগুলোর দিকে এগুলো। কয়েকটি দোকান ঘুরে লাল পাথর বসানো একটি আর কয়েক রঙের পাথর বসানো একটি বড় আংটি কিনলো। এই আংটিটি এত বড় যে মাঝের আঙুলে পরলে তর্জনী আর অনামিকা ঢেকে যায়। ম্যাচিং করে কানের দুল, হাতের ব্রেসলেট কিছুই বাদ গেলো না। মেয়ের জন্য চুলের ক্লিপ ছাড়া আর পছন্দের কিছু পেলো না। ওর পাশেই বোরখা পরা এক মায়ের সাথে তার মেয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে, আংটি ওর চাই-ই চাই।



জুয়েলারির দোকানের পরেই বাহারী কার্পেটের মেলা। কি সুন্দর বুনন, চমৎকার দৃশ্য! কিংবা কেবলই রঙের খেলা; মুগ্ধ চোখে দেখছে হাসান। কিন্তু নিয়ে যাওয়ার সমস্যা। একটু এগিয়ে রঙিন পাথরের হাতে তৈরি চারটি বিভিন্ন মাপের বাটি কিনলো। মার্বেলের মূর্তি আর ফুলদানী পছন্দ হয়েছে; ওজন আর আকার নিয়ে ভাবলো, দোনোমনা করে কিনেই ফেললো। আর একটি জিনিস বাকি, ঝাড়বাতি। এ গলি সে গলি ঘুরে ঝাড়বাতির দোকান খুঁজে পেলো। সোনালী মুকুটের মতো ধারক থেকে একই রঙের চেইন দ্বারা বাহারি নকশাদার কাঁচের গোলক ঝুলছে এমন একটি ঝাড়বাতি পছন্দ করে কিনে নিলো। হাসানের এবারের কেনাকাটা শেষ। দোকানি ঝাড়বাতি যত্ন করে প্যাকিং করে পই পই করে বলে দিয়েছে, ভুলেও লাগেজে দিবেন না, হাতে করে নিয়ে যাবেন। হাসান দোকানিকে আশ্বস্ত করেছে, ভাববেন না, আমি এটাকে যত্ন করে নিজ হাতে বহন করবো।

হোটেলে যখন পৌছলো তখন সূর্য ডুবে গেছে, বসফরাসের ট্রিপটি এবার বোধো হয় নেওয়া হলো না, হাসান রুমে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলো। সারাদিন গিয়েছে ফাহমিদার সাথে কথা হয় নি। নিশ্চয় মন খারাপ করে আছে। ফ্রেশ হয়ে এসে ফাহমিদাকে কল করলো, এক রিংয়ে ফোন ধরলো, গলাটি খানিক ভারী, 'ঠাণ্ডা লেগেছে?' হাসান জিজ্ঞেস করলো।

'না, তুমি সারা দিন কোথায় ছিলে? আমাদের কথা একবারও মনে পড়ল না?'

'সরি, বাইরে ছিলাম, ওয়াইফাই তো নেই, সরাসরি কল করলে তো অনেক বিল আসে, তো ভাবলাম সন্ধায় রুমে ফিরে কল করবো।'

'শুধু ঘুরাঘুরি করেছো, খেয়েছো ঠিকমত?'

'লক্ষ্মীসোনা রাগ কোরো না, বাইরে থেকে এসেই তোমাকে কল করলাম।'

'কেন? আর কল করার কেউ আছে না কি?'

'আহা! শোনো, গ্র্যান্ড বাজারে গিয়েছিলাম কেনাকাটা করতে, ভাইবার অন করো, আমি বিছানায় সাজিয়ে রেখেছি, দেখো পছন্দ হয় কি না!'

ওর কেনা জিনিসগুলো মা-মেয়ে দুজনেই ভীষণ পছন্দ করেছে। ফাহমিদা ওই দোকানির মতো করেই বারবার বললো, 'তুমি কিন্তু ঝাড়বাতি হাতে করে আনবে।' ওকে আশ্বস্ত করে মেয়ের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলো।

রুম সার্ভিসে রাতের জন্য স্যুপ আর স্যান্ডউইচ-এর অনুরোধ জানিয়ে বাথরুমে গেলো। বাথটাব হালকা গরম পানিতে ভরে মাথা হেলান দিয়ে শুয়ে থাকলো। ধীরে ধীরে শরীর থেকে সব ক্লান্তি, স্বেদবিন্দু, পানিতে মিশে যাচ্ছে; ওর সেলফোনে থেকে বি বি কিং-এর জ্যাজ শুনছে।

'You're the greatest thing in my life, baby
Between me and you I know I've got the best deal
Let me thank you, baby, you've been so true
I'd lose my mind if I lost you' —B B King (Album King of the Blues, 1960)



## ২৪

হাসান বাথটাব থেকে বেরিয়ে শরীর মুছে সাদা বড় বাথরোব জড়িয়ে মূল দরজা খুলতেই ট্রলিতে সাদা ন্যাপকিনে ঢাকা খাবার নিয়ে ওয়েটার রুমে এলো, 'আপনার আদেশ করা খাবার নিয়ে এসেছি, কোথায় রাখবো?'

'মাঝখানে রেখে যান, দয়া করে। আমার পোশাকের জন্য দুঃখিত।' ওয়েটারকে চল্লিশ লিরা বখশিস দিলো। ওয়েটার খুশী হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বললো, 'আপনার খাওয়া শেষ হলে অনুগ্রহ করে ট্রলিটি বাইরে রেখে দিবেন।'

'তথাস্তু।' হাসান টেলিভিশন ছেড়ে দিয়ে সিএনএন দেখতে দেখতে বেশ মজা করে খাবার খেয়ে ট্রলি রুমের বাইরে রেখে দিলো। দুটো বালিশে হেলান দিয়ে ভাবলো এবার টুনটুনিকে কল করা যায়। ভাইবারে ভিডিও কল দিতেই ও একবারে সাড়া দিয়েছে, মনে হয় অপেক্ষায় ছিল।

'হ্যালো, কেমন আছেন?'

'ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এতক্ষণ পরে আমাকে মনে পরলো?' টুনটুনির উত্তর। ও আজ গাঢ় বেগুনি স্লিভলেস নিটের গেঞ্জি পরেছে। বুকের উপরে সাদা রঙের 'স্ট্রং ইজ প্রেটি' প্রিন্ট করা, সেই লকেটটি ঝুলছে মাঝখানে, নিটের কাপড় ভেদ করে উদ্ধত যৌবনের আভাস। ঢাকায় প্রায় দুটো বাজে।

'ঘুমোন নি এখনও?'

'না, নাটকের শুটিং ছিল, ফিরে ফ্রেশ হয়ে একটু গা এলিয়েছি, আপনার কথা বলুন।'

'আমি সারাদিন বাইরে ছিলাম, নীল মসজিদ, তোপকাপি প্রাসাদ আর গ্র্যান্ড বাজার হয়ে সন্ধ্যার পরে ফিরেছি। আপনার বাসায় সবাই কেমন আছে?'

'এই তো, চৈতি পাশেই ঘুমুচ্ছে, বড়টা ওর রুমে কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত আর শরীফ তো ময়মনসিংহ, উইকেন্ডে আসবে। অনেক ঘুরলেন, না! কেনাকাটা করেন নি?'

'করেছি।'

'দেখান না, প্লিজ।'

হাসান যা কিনেছে সেগুলো আবার বিছানায় বিছিয়ে দেখালো, জানাতে ভুললো না যে ওর জন্য বিশেষ কিছু আছে যা এখন দেখাবে না। সারপ্রাইজ না হয় ঢাকার জন্য থাকুক। টুনটুনির মুখ দেখে বুঝলো খুশিতে ঝলমল করছে, সারপ্রাইজ মেনে নিয়েছে।

'এখন বলেন আমাকে কেমন লাগছে?'

"বরাবরের মতোই সুন্দর। আমি যখন স্কুলে পড়ি আমার বাংলার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সুন্দর বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন যখন কাউকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে সেটিই হচ্ছে 'সুন্দর'—আপনি তেমনটি সুন্দর।"

অনেকক্ষণ চুপ থেকে টুনটুনি অস্ফুট স্বরে বললো, 'আমাকে এমন করে কেউ কখনও বলে নি, আর আপনি জানেন আজ প্রায় বারো বছর আমি আর শরীফ আলাদা ঘরে থাকি।'

'আচ্ছা, আপনার কথা বলেন, শুনবো।'

'কি শুনবেন এলোমেলো মানুষের কথা! আমি কোথায়, আর আপনি!'

'আহা! রাখেন তো, বলুন প্লিজ।'

'বলবো, কিন্তু আপনি ওই বাথরোব পরে থাকলে আমি যে লোভী হয়ে উঠি।'

'থাকলেন না হয় ক'টা দিন লোভী হয়ে, কি এমন হবে? এবার বলুন,' হাসান হাত বাড়িয়ে ছাদের বাতি নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিলো।



## ২৫

টুনটুনির কথা ঃ

চট্টগ্রাম থেকে একবছর পর শরীফের বদলি হল বরিশালে। আমি ভীষণ খুশী। আমাদের গ্রামের বাড়ী পটুয়াখালী। বাড়ীতে এক চাচা থাকেন; এবার ওই দিকে যাওয়ার সুযোগ হবে। প্রথমে শরীফ আমাকে নিতে চাইলো না, বললো, 'তুমি একা একা থাকবে, এর চেয়ে ঢাকায় আমার বড় বোনের বাসার কাছেই বাসা ভাড়া করে দেই, তোমার ভালো লাগবে। তাছাড়া তোমার বড় বোনও ঢাকায় থাকেন।' আমার জোরাজুরিতে আমরা বরিশাল গেলাম। উত্তর আলেকান্দা সড়কে একটি পাঁচতলা ভবনের দোতলায় বাসা ভাড়া নেওয়া হলো, আবারো শুরু হলো টোনাটুনির সংসার।

শরীফের কথাগুলো ঠিক হলো, ওকে আগের মতই নির্লিপ্ত আর দূরের মানুষ মনে হলো। সকালে বেরিয়ে যায়, দুপুরে বাসায় ফেরে তো ফেরে না, সন্ধ্যার আগে ওর দেখা মিলে না। তখনও মোবাইলের যুগ আসে নি। সন্ধ্যায় ওর কিছু বন্ধু আসে তাদের নিয়েই ড্রয়িং রুমে আড্ডায় মেতে থাকে। আমি সারাদিন একা থাকি, ও ঘরে ফিরে এলেও একা থাকি। বরিশালে নাট্যজগতের কারো সাথে পরিচয় নেই, আর জানিও না নাট্যচর্চা তেমন করে হয় কিনা।

আমার খুব শখ ছিল নিজে কিছু করবো। শরীফকে একদিন ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তে, যা কদাচিৎ আমার ভাগ্যে জুটতো, ওর রোমশহীন বুকে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, 'আমার তো একা একা সময় কাটে না, তুমিও ব্যস্ত থাকো, আমি একটা বুটিকের দোকান দিতে চাই।' ও ছোট্টো করে বললো, 'আচ্ছা।' তারপরে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে গেলো। বিশ বছরের এক উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণীকে পাশে রেখে এভাবে কেউ ঘুমিয়ে যেতে পারে!

দিনদশেক পর শরীফ অফিস থেকে ফিরে জানালো যে, গির্জামহল্লায় ভেনাস শপিং সেন্টারে একটি দোকান ভাড়া হবে, আমি চাইলে ওর সাথে গিয়ে দেখে আসতে পারি। আমি যেন জীবন ফিরে

পেলাম। হেমায়েত উদ্দিন সড়কের উপরেই ভেনাস শপিং সেন্টার, নিচ তলায় প্রবেশমুখে প্রায় দেড়শ স্কয়ার ফুটের দোকানটি একনজরে ভালো লেগে গেলো। পরের দিন থেকেই সাজাতে লেগে গেলাম। সামনে কাঁচঘেরা তিনটি তাক, পিছনে এল শেপের খোলা আলমিরা, ছোট দিকটায় চারটি তাক, তার নীচে কপাট দেওয়া স্টোর, বড় দিকটায় হ্যাঙ্গার ঝুলানোর ব্যবস্থা করেছি।

আমি চকবাজারে গিয়ে কাপড় কিনে আমার ডিজাইন অনুযায়ী মহল্লার দরজীকে দিয়ে মেয়েদের কামিজ-সালওয়ার বানিয়েছি। আমার বিশ্বাস ছিল আমার রুচিবোধের উপর, গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে আধুনিকতার ছোঁয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার এক কাজিনকে সহকারি হিসেবে রাখলাম। সকাল দশটার মধ্যেই দোকান খুলে পরিষ্কার করে বসে থাকতাম। দুপুরের আগে স্কুল-কলেজ ফাঁকি দেওয়া কিছু কাস্টমার পেতাম। ওরা কাপড়গুলো হাতে নিয়ে দেখতো, চমৎকৃত হতো। কিন্তু খুব কমই বিক্রি হয়েছে, হয়তো ওদের সামর্থ্য নেই। দুপুরে আমার কাজিনের উপর দোকানের ভার দিয়ে বাসায় চলে যেতাম। আমার একটা মলটিজ ল্যাপ ডগ ছিল, সাদা লোমে ভরা, গভীর কাল চোখ একদম মার্বেলের মতো; আমাকে দেখলেই দৌড়ে এসে কোলে উঠে বসতো। শরীফ আমাকে কিনে দিয়েছিলো, নাম দিয়েছিলাম 'টুনটুন'। দুপুরটা ওর সাথে কাটিয়ে নেয়ে-খেয়ে আবার শেষ বিকালে ফিরে আসতাম।

বিকেল আর সন্ধ্যায় কিছু ভিড় হতো। দোকানের একটু পরিচিতি হলো, কেন জানি প্রতি মাসেই লোকসান হতো। ছয় মাসে বেশ ক্ষতি হওয়ার পর শরীফ বললো আমিতো আর সাপোর্ট দিতে পারছি না, দোকানটি যে বন্ধ করে দিতে হয়। আমি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বসে রইলাম। মনের ভিতর ঝড় বইছে, আমি সফল হতে পারবো না, মন মেনে নিতে চাইছে না। আবার এদিকে আমি কনসিভ করেছি, শরীর কুলোচ্ছে না। শরীফকে তখনও ব্যাপারটি বলি নি। কেবল এক সপ্তাহ গিয়েছে, একটু নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম।



আমি শরীফকে বললাম, 'আমি কনসিভ করেছি।' ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো, খুশী না অখুশী, ওর চোখের ভাষায় বুঝে উঠলাম না। শুধু বললো, 'তাহলে দোকান বন্ধ করে দেই। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

পরের দিন রাতের খাওয়া শেষে দু'জনে টুকটাক কথা বলছি, দোকান কিভাবে বন্ধ হবে, অবিক্রিত মালামাল কি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। হঠাৎ করে শরীফ বললো, 'তুমি চোখ বন্ধ কর, আমি না বললে খুলবে না।' ও ড্রয়িং রুমে চলে গেলো, আমি চোখ বন্ধ করে বিছানায় বসে আছি, একসময় ওর হাতের স্পর্শ পেলাম আমার গলায়। 'একদম চোখ খুলবে না,' আবারও বারণ করলো শরীফ। আমার ঘাড়ের পিছনে কি যেন আটকে দিল, বুকের উপর ঠাণ্ডা ধাতব অনুভুতি; বললো, 'এবার চোখ খুলো।'

ভীষণ সুন্দর এক সোনার জড়োয়া সেট আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছে। আমায় জড়িয়ে ধরে গভীর চুমু দিয়ে বললো, 'আই এম সো হ্যাপি, আনা।' আনন্দে আমার চোখে বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, এই প্রথম আমার স্বামীকে রোমান্টিক হতে দেখলাম। আমিও ওকে জড়িয়ে ধরলাম, বাইরে প্রবল বৃষ্টি, ধীরে ধীরে ওর কাছে নিজেকে উন্মোচিত করলাম। শরীফ আমাকে অনেক যত্ন নিয়ে ভালোবাসলো, সেই প্রথম দিনের মতো।

এর পরে আমরা বরিশালে আর সপ্তাহ দুয়েক ছিলাম। ও আমাকে একা বরিশাল থাকতে দিবে না। ঢাকায় নিকুঞ্জতে বাসা ভাড়া নিলো। ওর মা আমার সাথে থাকলেন। টুনটুনকে ছেড়ে আসতে অনেক কষ্ট হয়েছে। আমার চাচার বাসায় ওকে রেখে এলাম। যখন রেখে আসি দেখি টুনটুন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, ও বুঝতে পেরেছে, ওর সাথে আমার দেখা হয়তো হবে না। আমি লঞ্চের পুরোটা রাত কেঁদে বুক ভাসিয়েছি। জানেন, হাসান, আমি চলে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই টুনটুন চলে গেলো। আমি যাদের ভালোবাসি ওরা এমন করে চলে যায় কেন? বলতে পারেন?

ওপাশে নিঃশব্দ কান্না টের পেলো হাসান। 'ভালোবাসার মানুষ বা যেই হোক না কেন, ওরা চলে যায় না, ওরা থাকে হৃদয়ের গভীর কোণে, কখনও কখনও ওদের মনে পড়বে, সুখানুভূতি জাগবে, কখনও বা কাঁদবেন, এটাই জীবন। তবে ভালোবাসার মানুষকে যে ছেড়ে দেয় তার মতো দুর্ভাগা আর কেউ হয় না,' হাসান বললো।

কিছুটা সময় দিয়ে হাসান বললো, 'প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি কাল পরিদর্শনে যাবো। আর রাতেই ফ্লাইট। পরশু সকালে ঢাকা পৌঁছব।'

'আপনার সাথে দেখা হবে কখন?' টুনটুনির প্রশ্ন।

'পরশু টায়ার্ড থাকবো, তার পরদিন আমরা একসাথে লাঞ্চ করবো,' জানালো হাসান।

'ঠিক আছে, কাল এয়ারপোর্ট থেকে রিং দিবেন।'

'ওকে, ভালো থাকবেন, বাই।'

'আপনিও, বাই।'

হাসান দুপুরের পরে চেক-আউট করে লাগেজ ওদেরই লকারে রেখে আশপাশে ঘুরতে বেরুলো। পায়ে হেঁটে যতটুকু দেখা যায়। এক সময় ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলো, বাড়ী ফিরতে মন চাইছে। ট্যাক্সি ডেকে ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্ট, চেক-ইন করে ডিউটি ফ্রি শপ এলাকায় গেলো। কেনাকাটা সেরে ফাহমিদাকে কল করলো, ওখানে অনেক রাত, ওর ঘুম ভাঙানোর জন্য খারাপ লাগলো। তারপরও জানালো যে এয়ারপোর্টে আছে, ফ্লাইট সময়মত ছাড়বে।

এরপরে টুনটুনিকে রিং দিল, ব্যস্ত। খানিকটা বিরক্ত হয়ে ফোন বন্ধ করে দিলো। বিমানে উঠবার মিনিট দশেক আগে ফোনটি অন করা মাত্রই টুনটুনির কল এলো, 'সরি, বিজি ছিলাম। প্লেনে উঠে গেছেন।'

'না, উঠবো এখন, আপনি আমাকে বলেছিলেন এয়ারপোর্ট থেকে রিং দিতে,' হাসানের কথায় ক্ষোভ ঝরে পরছে।



'কি করবো, ফোন আসে, কথা বলতে হয়, রেখে তো দিতে পারি না।'

'আচ্ছা, আমি রাখি, আপনার কল এসেছে মনে হয়, বাই,' হাসান আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফোন সুইচ অফ করে বিমানে প্রবেশ পথের দিকে এগুলো।

## ২৬

হাসান ঢাকায় ফিরে পুরোটি দিন বাসায় কাটালো, অনামিকা ওর কাছ ছাড়া হয় না। ফাহমিদা রান্না ঘরেই ব্যস্ত, ওর ধারনা হাসান তুরস্কে না খেয়ে ছিলো। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার টুনটুনির ফোন এসেছে, ধরেনি। প্রথম দিকে কেটে দিয়েছে। ফাহমিদা জিজ্ঞেস করলে বলেছে নাম্বার অপরিচিত। পরে ফোন সাইলেন্ট মোডে দিয়ে রাখলো।

পরদিন সকালে অফিসে পৌঁছে হাসান ম্যানেজার সাহেবকে ডেকে টার্কিশ কোম্পানির সাবমারসিবল পাম্পের জন্য এলসি খোলার নির্দেশ দিলো। আর টুকটাক কাজ করতে করতে দুপুর হয়ে এলো। অফিস স্টাফদের জন্য আনা স্যুভেনিরগুলো দিলো, খুব খুশী হয়েছে। লাঞ্চের সময় পিয়ন ছাড়া কেউ নেই, ম্যানেজার ব্যাংকে গেলেন এলসি'র বিষয়ে কথা বলবেন, অন্যেরা খেতে গেলো। অফিসের দরজায় কলিং বেলের শব্দে পিয়ন দরজা খুলে দিলো, একজন মহিলাকে দেখে বললো, 'কার কাছে এসেছেন?'

'আপনার স্যার নেই?'

'কোন্ স্যার? ম্যানেজার স্যার, কমার্শিয়াল স্যার, অ্যাকাউন্টের স্যার, সব স্যার-ই তো বাইরে। আপনি ক্যার কাছে আসছেন?'

'হাসান সাহেব।'

'ওহ্! আগে কইবেন তো। আহেন।'

হাসান তার রুমের দরজায় টোকা পড়তে অবাক, এখন তো অফিসে কেউ নেই, সাধারণত পিয়ন কবির ওকে এসময় বিরক্ত করে না; ভারী গলায় বললো, 'কে'?

'স্যার, একজন ম্যাডাম আসছেন,' বলেই কবির দরজা খুলে দিলো। দরজায় দাঁড়িয়ে টুনটুনি বললো, 'আমার একজনের সাথে আজ লাঞ্চের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।'

'ওহ্! আপনি! কি সৌভাগ্য আমার। প্লিজ বসেন,' কবির ঠিক আছে তুমি যাও।



'স্যার, আমি বাড়ী যাইতাম, মাইয়াটার জ্বর।'

'আচ্ছা যাও, এই টাকাটা ধরো,' হাসান একটি পাঁচশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'ডাক্তার দেখাও।'

কবির বেরিয়ে যেতেই টুনটুনি, 'আপনাকে উঠতে হবে না আমি বন্ধ করে দিয়ে আসছি বলে মেইন দরজা ছিটকিনি দিয়ে এলো।'

হাসানের রুমে এসে ওকে চেয়ার ছেড়ে উঠবার সুযোগ না দিয়ে রিভল্ভিং চেয়ারে বসা হাসানের কোলে বসে ওকে জড়িয়ে ধরে, 'আপনি রাগ করেছেন। আমাকে ক্ষমা করবেন না?' বলে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। হাসানের নীরবতায় টুনটুনি হাসানের ঠোঁটের উপর নিজের ঠোঁট চেপে ধরলো, প্রবল আবেগে ওকে চুমু খেতে থাকলো, যেন হাসানের সব ক্ষোভ শুষে নিবে। একসময় হাসান নিজের মুখের ভিতর ওর জিভ আর নিজের জিভের পরম সখ্যতা টের পেলো। হাসান বুঝলো ও হেরে যাচ্ছে, ও হারিয়ে যাচ্ছে।

খানিকটা জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'আমরা লাঞ্চে যাবো।'

'যাবো, তার আগে আই উইল হ্যাভ মাই লাঞ্চ, দেন উই গো আউট ফর আওয়ার লাঞ্চ,' বলে টুনটুনি কোল থেকে নেমে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো, পায়ের হাই হীল শু দুটি ঘড়ের কোণে ছুড়ে দিলো, অভ্যস্ত হাতে হাসানের বেল্ট খুলে, প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে দিলো। হাসানের বাঁধা শিথিল, জেগে উঠছে শরীর, মন বলে ঠিক হচ্ছে না, এই দ্বন্দ্বে অনেকটাই অসার হয়ে, অসহায় হয়ে আগ্রাসন উপভোগ করছে। টুনটুনি ওর মুখ নামিয়ে আনলো হাসানের পুরুষত্বে, হাসানের দু'হাত ওর নিজের সাথে বিদ্রোহ করে টুনটুনির ঝাকড়া চুল আঁকড়ে ধরলো। পরম আশ্লেষে নিবিড় মনোযোগে টুনটুনি ব্যস্ত। একসময় হাসান বলে উঠলো, 'আর না!'

'ডোন্ট ইউ ডেয়ার,' বলে টুনটুনি উঠে দাঁড়ালো, ত্রস্ত হাতে ব্ল্যাক টাইটস খুলে ফেলে গলফ কোর্সের দিকে মুখ ফিরে হাসানের পুরুষত্ব নিজের গভীরে প্রবেশ করালো।

'আই ক্যান্ট ওপেন মাই টপস, ইট উড বি স্পয়েল্ড, প্লিজ হোল্ড মি টাইট।'

স্তিমিত হয়ে এলো ঝড়। টুনটুনি গা এলিয়ে দিলো হাসানের উপর, মুখ ঘুরিয়ে হাসানকে প্রগাঢ় চুম্বনে আঁকড়ে ধরলো, ধীরে ধীরে ওর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো, বললো, 'আমি ফ্রেশ হয়ে আসি, এরপরে আপনি অথবা একসাথেও যেতে পারি।'

'না, ঠিক আছে, আপনি যান।' হাসান নিজের প্যান্ট, শার্ট কিছুই ঠিক করলো না, ও গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন।

টুনটুনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলে ও নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে ফিরে এলো। প্রথম যে কথাটি ও টুনটুনিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কাজটি কি ঠিক হলো, আমাদের কি ওই পর্যায়ে যাওয়ার সময় হয়েছে? তা ছাড়া আপনার সমস্যা তো হতে পারে?'

'দেখুন, আমার আপনাকে ভালো লাগে, আমার তো দেবার কিছু নেই, এই না হয় হলো আপনার জন্য আমার নিবেদন, আর আমার কপার টি পড়া আছে, কিছু হবে না।'

'কপার টি কেন?'

'আমরা কত জায়গায় কাজ করি, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যদি কিছু হয়ে যায়? সতর্ক থাকতে তো সমস্যা নেই।'

হাসান ড্রয়ার খুলে স্বরোভস্কির একটি প্যাকেট বের করে টুনটুনির হাতে দিলো। টুনিটুনি প্যাকেট খুলে ভিতরের জিনিস দেখে হাসানকে জড়িয়ে ধরে আবারো চুমু দিয়ে বললো, 'আপনি মনে রেখেছেন? আপনি পরিয়ে দেন।'

ও নিজের কানের দুল দুটি খুলে ফেললো। হাসান স্বরোভস্কির ছোটো হীরক রাজ হংস কানের দুল টুনটুনির দুই কানেই পরিয়ে দিয়ে বললো, 'আমরা বোধ হয় খুব বেশী কাছাকাছি এসে গেছি।' টুনটুনি ওর দু'হাত ধরে চোখের গভীরে তাকিয়ে বললো, 'হলামই না হয় কাছাকাছি।'



'যতোই তোমার কাছ
থেকে আমি দূরে যেতে চাই
ততো মিশে যাই নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে,
ততোই তোমার আমি হয়ে পড়ি ছায়ার মতন;
কোনোদিকে যাওয়ার আর একটুও জায়গা থাকে না
তুমিই জড়িয়ে রাখো তোমার কাঁটায়।
তোমাকে ছাড়তে গিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে
আরো জড়িয়েছি
তোমাকে ভুলতে গিয়ে আরো
ভালোবেসেছি তোমাকে।' —মহাদেব সাহা

## ২৭

হাসানের দিনটি ভাল যাচ্ছে, অফিসে এসে খবর পেয়েছে যে ওর কোম্পানি টেন্ডারে কারিগরী এবং আর্থিক উভয় দিকেই যোগ্যতম বিবেচিত হয়েছে। এর পিছনে সগীর ভাইয়ের বড় অবদান আছে; ওর কাজের পিছনে দৌড়াদৌড়ি দেখে ওকে বললেন যে, 'এভাবে তুমি কাজ পাবে না।'

'তাহলে কি করবো?'

'ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকৌশলীকে আমি চিনি। ওনার সাথে একদিন সন্ধ্যায় তোমাকে নিয়ে বসি, কথা বলো উনি কনভিন্সড হলে কাজ পাবে।'

সগীর ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী তুরস্কে যাওয়ার সপ্তাহ দুয়েক আগে এক সন্ধ্যায় হোটেল পূর্বাণীতে মিটিং হলো। এই হোটেলটিতে হাসান কখনও আসেনি। বাণিজ্যিক এলাকার বলতে গেলে কেন্দ্রবিন্দুতে। চারপাশ ঘিরেই সরকারি দপ্তর। একটি ব্লক পরেই দক্ষিণ দিকে 'বঙ্গভবন'। হাসান সময়ের আগেই পৌঁছে গেছে। নিরাপত্তার ঘেরাটোপ পেরিয়ে লবিতে পা দিয়ে ওর মনটা জুড়িয়ে গেলো। বনেদী হোটেলের বনেদী ভাবটি ষোলআনাই আছে। কালো-সবুজের মার্বেলে মোড়া মেঝে, মাঝখানে দুটি কালো টাইলসে আবৃত খিলান তিনতলা অবধি উঠে গেছে; কোণায় কোণায় ধূসর, বাদামি আর কালচে পাথরের মূর্তি। এট্রিয়াম লাউঞ্জের দুই পাশ থেকে সিঁড়ি উঠে উপরে কোথাও হারিয়ে গেছে। লবি থেকে চারধাপ উঠে আবার নীচে নেমে এট্রিয়াম লাউঞ্জ। হাসান প্রবেশপথ দেখতে পায় এমন একটি টেবিল বেছে নিয়ে বসলো। প্রবেশ পথের ওপরে অনেকটা অংশ জুড়ে রঙীন টাইলস দিয়ে আবহমান গ্রাম বাংলার প্রতিকৃতি। এট্রিয়াম লাউঞ্জ-এর চারপাশের বাদামী রঙের খিলানগুলো দোতলার একটু উপরে শেষ হয়ে তার মাথায় গোলাকৃতির কাঁচের বাতি, রেলিং ঘেসে সবুজ ঝিরি ঝিরি পাতার টব। খানিক পরেই সগীর ভাই সেই ভদ্রলোককে নিয়ে ভিতরে এলেন, হাসানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পঞ্চান্ন ছুঁই ছুঁই মাঝারী উচ্চতার



স্ফীত মধ্য প্রদেশের একজন মানুষ, মোটা গোঁফ, কলপ দেওয়া কাল কোঁকড়ানো চুল, সাদা হাফ শার্ট, বুক পকেটে কলম, পুরো দস্তুর আমলা। সগীর ভাই ওকে আগেই বলে দিয়েছিলেন তুমি কথা কম বলবে, আমি ওনাকে কনভিন্স করবো, তোমার প্রস্তাবের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকশন সাথে রেখো। করমর্দন করে তিনি নাম না বলে মানিব্যাগ থেকে নিজ নামাঙ্কিত কার্ড হাসানকে দিলেন।

হাসান ভদ্রলোককে বললো, 'স্যার, আমি হাসান, একজন ছোট ব্যবসায়ী, মেশিনারীজ ইম্পোর্ট করি, তবে মান নিশ্চিত করি এবং দামের ক্ষেত্রে কমটাই দেওয়ার চেষ্টা করি। সগীর ভাইয়ের স্নেহের ছায়ায় আছি।'

সগীর বিষয়টি এগিয়ে নিলেন, 'স্যার, ওকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি, সৎ ছেলে, আপনারা ভাল জিনিস পাবেন, চাইনিজ মাল নিয়ে ঠকবেন না; আমরা তিন ভাই একটা কাজ একসাথে করি, লাভ যা হয় ভাগ করে নিবো।' হাসান বুঝলো যে ওর এই কাজ হলে সগীর ভাইকেও সন্তুষ্ট করতে হবে।

হাসান লক্ষ্য করলো যে, ভদ্রলোক একটুও বিব্রত হলেন না, বরং বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার টেক স্পেক দেখি।' এর মধ্যে ওয়েটার এসে কফি আর স্ন্যাক্স-এর অর্ডার নিয়ে গেছে। খেতে খেতে বাকি আলোচনা হলো। ঠিক হলো হাসান তুরস্ক থেকে ফিরে ওনার সাথে কথা বলে টেন্ডার ড্রপ করবে।

সেই মিটিং আর সফল তুরস্ক সফর তার কাজটি পাইয়ে দিয়েছে, ও প্রথমেই সগীর ভাইকে ধন্যবাদ জানালো। সগীর ভাই বললেন, 'আমিতো কাল রাইতেই জানি যে আপনি পাইবেন। যাক, ঠিকমত করেন, আমি আছি আপনার সাথে।'

এরপরে ফাহমিদাকে ফোনে দিয়ে বললো, 'দুপুরে আমরা আজ বাইরে খাবো।'

'রান্না যে শুরু করেছি!'

'থাকুক, টেন্ডারে কাজটি পেয়েছি।'

‘গাড়ী পাঠিয়ে দিবো দেড়টার দিকে, রেডি থেকো।’

‘আচ্ছা, রাখছি।’

বনানী ১১ নং রোডের প্লাটিনাম গ্র্যান্ডের সামনে থেকে হাসান ফাহমিদা ও অনামিকাকে ওই দালানের দোতলায় ‘টেরা বিস্ত্রো’ রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করে আগে থেকেই সংরক্ষিত টেবিলে নিয়ে গেলো। রেস্টুরেন্টের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা আধুনিক ধাঁচের, ছাদে কালো এবং সোনালী কাঠের প্যানেলিং করা, ছাঁদের আলো সরাসরি চোখে পড়ে না, গাঢ় কমলা রঙের কুশন চেয়ার বেশ আরামদায়ক, কালচে বাদামী টেবিল তার চারপাশে কৃত্রিম মার্বেলের সাইড প্যানেল; সব মিলিয়ে মনোরম চোখ জুড়োনো পরিবেশ। বসতে বসতে ফাহমিদা জানতে চাইলো, ‘হঠাৎ করে আজ বাইরে এলাম, কি ব্যাপার?’

‘ওই যে বললাম, কাজটি পেয়েছি, ভাবলাম দুপুরে একসাথে খাই, এই আর কি।’

‘আচ্ছা, আগে অর্ডার দাও, তারপরে গল্প করা যাবে।’

ক্রিম অফ চিকেন, এসরটেড গ্রিল প্লাটার, ফ্রাইড কালামারি, স্প্যাঘেটি বেলোনিজ আর স্যতে মাশরুমের অর্ডার নিয়ে ওয়েটার চলে গেলো। এই সময়টায় বেশ ভিড় থাকে এখানে। মূলত অফিস পাড়ার লোকজনেরাই আসেন। অনামিকা উচ্ছল হয়ে বাবাকে জানালো ওর ক্লাসে নতুন বান্ধবী এসেছে, ওর সাথে বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। ‘আর বোলো না, অনামিকা সারাক্ষণ ওর নতুন বান্ধবীর কথা বলে, মেয়েটির বাবা আর্মিতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল, ভদ্রলোক প্রায়ই বিদেশ সফরে যান, ক্লাস না করে ওরা ওই গল্পই করে’, ফাহমিদার অনুযোগ। খাবার দিয়ে গেছে, খেতে খেতে ওদের গল্প চললো। হাসান জানালো যে, কাজটি হয়ে গেলে ওরা সবাই মিলে থাইল্যান্ড বেড়াতে যাবে। ‘ও মা, তাই! বাবা, ভীষণ মজা হবে, কবে যাবো?’ অনামিকার উচ্ছ্বাস ওর মাকেও ছুঁয়ে গেছে। ‘ধর, মাস দুয়েক পরে, অনামিকার পাসপোর্ট করে নেই, তোমার তো আছেই,’ হাসান স্মিত হেসে উত্তর দিলো।



খাওয়া শেষ করে ওদের বিদায় জানিয়ে হাসান আবার অফিসে ফিরে এসে ম্যানেজারকে নোটফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড আনার জন্য ওই সরকারী দপ্তরে পাঠিয়ে দিলো। অনেক কাজ বাকি, এগ্রিমেন্ট করতে হবে। সেই প্রধান প্রকৌশলীকে কিছু অগ্রীম দিতে হবে। এসব ব্যবস্থা করতে করতে বিকেল গড়িয়ে এলো। যখন সব গুটিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে ঠিক তখনই টুনটুনির ফোন।

‘হ্যালো, কি ভুলে গেলেন আবার?’

‘কোথায় ভুললাম, কালই তো কথা হলো।’

‘আজ তো হয় নি। আপনি কি সন্ধ্যায় ফ্রি আছেন?’

‘কেন? জরুরী কিছু?’

‘আমার একটি ছবি রিলিজ হয়েছে, এ সপ্তাহে, টঙ্গীতে আনারকলি সিনেমা হলের টিকেট মাস্টারকে বলে রেখেছি, আপনি যদি যান তাহলে আমরা ছয়টার ‘শো’ দেখতে পারি।’

‘আমি পাঁচ মিনিট পরে আপনাকে জানাই?’

‘ওকে, বাই।’

হাসান ভাবছে টুনটুনির অভিনয় শৈলী দেখা হয় নি, আবার এখন যদি ফাহমিদাকে বলে যে ফিরতে দেরী হবে ও হয়তো মন খারাপ করবে। ও চেয়ার থেকে উঠে জানালায় দাঁড়িয়ে গলফ মাঠের দিকে তাকিয়ে ভাবছে। পড়ন্ত বিকেলে বেশ ক’জন সুবেশী গলফার ক্ষুদ্র গলফ বলটিকে আরো ক্ষুদ্র গর্তে ফেলবার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টারত। শেষ পর্যন্ত টুনটুনির অমোঘ আকর্ষণ এড়াতে পারলো না, হাসান ফাহমিদাকে ফোন করে জানালো ওই প্রধান প্রকৌশলীর সাথে সন্ধ্যায় বসতে হবে কিছু বিষয় চূড়ান্ত করবার জন্য, ওর ফিরতে একটু দেরী হবে।

আরো কিছুক্ষণ খেলা দেখে টুনটুনিকে ফোনে করে জানালো যে ও আসছে এবং ওকে পাঁচটায় তুলে নিবে।

‘আমার শুধু ইচ্ছে করে সঙ্গে বসে থাকি

হঠাৎ করে তোমার গায়ে গোপনে হাত রাখি।
রাখতে রাখতে সাহস হবে,
সাহস থেকে প্রেম।
বুঝবে আমি শিকড়গুলো কিভাবে ছড়ালেম।
আমার শুধু ইচ্ছে করে সঙ্গে ভেসে যেতে,
ভাসতে ভাসতে সবটা নদী বুকের কাছে পেতে।
এমনি করেই সাহস হবে,
সাহস থেকে প্রেম!
তখন তুমি বুঝবেও না যে কিভাবে জড়ালেম।' —নির্মলেন্দু গুণ



## ২৮

হাসান পৌনে পাঁচটায় গুলশান ২ নং মোড়ে 'ল্যাভেন্ডার' দোকানটির সামনে গাড়ী পার্কিং করে টুনটুনিকে ফোন করে জানিয়ে ভিতরে ঢুকে কয়েকটি 'লেস' পটেটো চিপসের প্যাকেট, ক্যাডবেরি ও স্নিকারস চকোলেট কিনে বেরোলো। ওর মধ্যে চনমনে ভাব, খানিকটা উত্তেজনা কাজ করছে। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ তরুণ তাঁর প্রথম অভিসারে যাবার বেলায় যেমনটি অনুভূতি জাগে, ওর ঠিক তেমনটি লাগছে। কেউ কি দেখছে ওকে, কেউ কি বুঝে ফেললো, একটু শিহরণ, শরীরে রোম দাঁড়িয়ে গেছে। নিজের ওপর বিরক্ত হলো, ধ্যাৎ এটা কি হচ্ছে? এমনটি নয় যে টুনটুনির সাথে আগে বেরোয় নি কখনো; মনকে শাসন করে দোকান থেকে বেরোলো।

টুনটুনি দাঁড়িয়ে দোকানের সামনেই, সাদা-কালো জংলী ছাপের ঢিলেঢালা পলিয়েস্টার-কটন মিক্সড টপস, কালো পালাজ্জো, হাই হিল আর সাথে ঢাউস সাদা ব্যাগ, লাল লিপস্টিক, একমাথা লালচে-বাদামী চুল যা ওকে মুহূর্তেই অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়।

'সুন্দর লাগছে আপনাকে,' হাসান অবলীলায় প্রকাশ করে, গাড়ির দরজা খুলে দেয়। টুনটুনি গাড়িতে বসতে বসতে বলে, 'আপনাকে যখন ফোন করি তখন পার্লারে ছিলাম, অনেকদিন যাওয়া হয় না, চুল রঙ করিয়েছি, ফেসিয়াল করালাম, আমার পায়ের যা অবস্থা! ওগুলোর কাজ করালাম, কেমন হয়েছে চুলের রঙ?'

হাসান গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওই যে বললাম আপনাকে সুন্দর লাগছে।'

'আপনি না কেমন! প্রাণভরে বলতে পারেন না?'

'সুন্দরকে সুন্দরই বলতে হয়, মনের ভাষা সব কি বলা যায়? না কেউ বলতে পারে? যে বুঝে সে বুঝে, যে বুঝে না তাকে অনেক শব্দ দিয়ে বললেও বুঝবে না। আপনি কি খেয়াল করেছেন, আপনি যখন কোথাও দাঁড়ান, যেন থমকে যায় সব কিছু, সময় থেমে যায়, ওই স্তব্ধতার অনিন্দ্য সৌন্দর্য আপনাকে ছুঁয়ে যায়?'

এবার লজ্জা পায় টুনটুনি, কপোলে রক্তিমাভা, লজ্জায় যখন চোখ নামালো চোখের পাতায় নীলচে-সবুজ মাসকারা শেষ বিকেলের আলোয় চিকচিক করছে, 'আর বলতে হবে না, এবার চালান।'

হাসানের পার্ল রঙের হোন্ডা গ্রেস কুড়িল ফ্লাইওভার হয়ে টঙ্গীর পথে চলল। গাড়ীর স্পিকারে বব মারলের গান… ' I wanna love you and treat you right, I wanna love you every day and every night।'

টুনটুনি জিজ্ঞেস করলো, 'কে গাইছে?'

'বব মারলে, আগে শুনেন নি?'

'না, ভলিউমটা বাড়িয়ে দেন।'

বব মারলের গানের সাথে গাড়ী একসময় পৌঁছে গেলো আনারকলি সিনেমা হলের সামনে। টুনটুনি তখনও চোখ বন্ধ করে গানের স্বাদ নিচ্ছে। হাসান পার্কিং-এ গাড়ী রেখে এক মিনিট অপেক্ষা করে মিউজিক প্লেয়ার বন্ধ করলো। টুনটুনি চোখ খুলে জানতে চাইলো, 'পৌঁছে গেছি?'

'হ্যাঁ, ওই যে আপনার টিকেট মাস্টার আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।'

গাড়ী থেকে বেরুতেই তিনি এগিয়ে এলেন, 'ম্যাডাম, অনেকদিন পর আইলেন। চলেন উপরে যাই গা, সময় বেশি নাই।' হাসান টুনটুনিকে ইশারা করলো কত দিবে, টুনটুনি হাত দিয়ে নিষেধ করলো, মুখে বললো, 'পরে।'

হলের ভিতর আলো নিভে গেছে, বিজ্ঞাপন শুরু হয়েছে। প্রথমটিই পুরুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর। অন্য কোথাও এত উচ্চকিতভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞাপন দেখে নি হাসান। লাইটম্যান টর্চের আলোয় ওদের একদম উপরের শেষ সারিতে নিয়ে এসে জানালো যে, পুরো সারিটি ফাঁকা, ওরা চাইলে যে কোন আসনে বসতে পারে। ওরা মাঝামাঝি বসলো। অরস্যালাইন আর জীবন বীমার বিজ্ঞাপনের ফাঁকে; হাসান বুঝতে পারলো না ছবিটি দেখার পর ওর কোনটি লাগবে, কনডম. অরস্যালাইন নাকি জীবনবীমা করতে হবে!



সব মিলিয়ে হয়তো একশ'র কাছাকাছি দর্শক আলো-আঁধারে বসে আছে। বেশির ভাগই জোড়ায় জোড়ায়। বিজ্ঞাপন শেষে জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠেছে। লাল-সবুজ পতাকা ভাসছে সিনেমা হলের পর্দা জুড়ে। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাচ্ছে। হাসান লক্ষ্য করলো ওদের সামনের সারির জুটিসহ বেশির ভাগই বসে আছে। ও সামনের জুটির উদ্দেশে কিছু বলতে চাইলে টুনটুনি ওর হাত চেপে ধরে বললো, 'থাক।' হাসান অবাক হলেও বুঝলো টুনটুনি কোন ঝামেলায় জড়াতে চাচ্ছে না।

মিনিট দশেক ছবি চলার পর হাসান বুঝলো এটি একটি গতানুগতিক প্রেমের গল্প। মধ্যবিত্ত পরিবারের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া সুদর্শন ছোট ছেলে একই বিভাগের উচ্চবিত্ত পরিবারের সুন্দরী কন্যার প্রেমপিয়াসী। এটা নিয়ে পারিবারিক দ্বন্দ্ব। এখানে রিয়ানার (টুনটুনি) ভূমিকা স্নেহশীল বড় ভাবীর, দেবরের সব কর্মকাণ্ডে অকুণ্ঠ সমর্থন, কিছুটা শাসন আর বেশিটাই আদর। অভিনয় শৈলী দেখানোর খুব সুযোগ নেই আর হাসানের মনে হলো টুনটুনির অভিনয়ক্ষমতা অতি সাধারণ মানের।

সিনেমায় যে বড় ভাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছে তাঁর সাথে টুনটুনি অনেক আগে একটি সঙ্গীত নির্ভর ছবিতে স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছে, টুনটুনি জানালো। আহমেদ বণিক এই ছবিতে নায়িকার বড় ভাইয়ের চরিত্রে আছেন, যিনি টুনটুনিকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন; একটু একটু করে হাসানের কাছে সমীকরণটি স্পষ্ট হচ্ছে।

এরই মধ্যে ওদের সামনের সারির যুগল ছবি না দেখে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত; কিছু সময় পরে ওই যুগল একদম কোনার সীটে চলে গেলো, একটি সিটেই দুজনে বসেছে। হাসানের দৃষ্টি ওই দিকে গেলে টুনটুনি চাঁপা স্বরে বললো, 'ওই দিকে দেওয়ার দরকার নেই, হয়তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, থাকুক না নিজেদের মতো।' পর্দায় তখন রিয়ানা আর তাঁর স্বামীর শয্যাদৃশ্য, চার পায়ের জড়াজড়ি, স্ত্রীর চিবুক, গলা, ঘাড়ে স্বামীর ভালোবাসা সিক্ত আদর; টুনটুনি হাসানের হাত চেপে ধরে বললো, 'আপনাকে আর দেখতে হবে না, দৃশ্যে আমাদের মাঝে একটা পাতলা বালিশ ছিল।' হাসান ওর হাতটি ধরে রাখলো, বললো, 'এটা

নিয়ে ভাবতে হবে না, বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করতে গেলে যতটুকু করতে হয় তাতো করবেনই।'

টুনটুনির অস্বস্তিবোধ বুঝে হাসান অন্য প্রসঙ্গে গেলো, 'আচ্ছা, আপনাকে একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি?'

'করেন, আমার লুকোবার কিছু নেই,' টুনটুনির সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'আপনার জীবনে শরীফ ছাড়া প্রেম আসে নি?' জিজ্ঞেস করে নিজেই থমকে গেলো, ওর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে হঠাৎ এমন প্রশ্ন করা সমীচীন হলো কি!

টুনটুনি ওর ধরে রাখা হাতটি বুকের কাছে নিয়ে বললো, 'আপনার কাছে আমি সব বলতে পারি।'



## ২৯

টুনটুনির কথা ঃ

ওর নাম ছিল ইফতেখার হাসান, আমি ডাকতাম ইফতি বলে, তবে কারো সামনে না। আমার বড় মেয়েটি কেবল তিন বছর হয়েছে, আমরা নিকুঞ্জের বাসাতেই থাকি। আমার শ্বাশুড়ি আমাদের সাথে থাকেন। শরীফ সপ্তাহান্তে আসতো কখনো আসত না। মেয়েটি রাতে কাঁদে এই অজুহাতে ও আলাদা রুমে থাকা শুরু করলো। কখনও কখনও আমাকে মাঝ রাতে মেয়ের পাশ থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেত। ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে যেত, আমার ভালো লাগলো কি লাগলো না এ ব্যাপারে কখনই জানতে চায় নি। আমি নিজে থেকেই সাড়া দিয়েছি। আমি তখন তেইশ কি চব্বিশ বছরের যুবতী, কতদিন পারি একা একা দিন কাটাতে বলতে পারেন?

এক বৃহস্পতিবার শরীফ সন্ধ্যায় ময়মনসিং থেকে বাসায় এসেছে, ওর সাথে ওর বন্ধু, আগে কখনও দেখিনি। পরিচয় করিয়ে দিলো, ইফতেখার হাসান, গার্মেন্টস ব্যবসায়ী, গাজীপুরে ফ্যাক্টরি আছে। শরীফ বললো, 'তোমরা কথা বলো, আমি ফ্রেশ হয়ে আসি।'

ইফতেখার আমাদের ছোট ড্রয়িং রুমের সোফায় আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। আমি পলকহীন চোখে দেখছি, এত সুন্দর মানুষ হয়! ও খুবই সুদর্শন, একহারা লম্বা গড়নের, শরীরে কোনো মেদ নেই, একমাথা ঘন কালো চুল অনেকটা 'লিওনার্দো ডি কাপ্রিও'র মতো, ভীষণ ফর্সা বিদেশী বলে ভ্রম হয়। আমার ভিতরটি মোচড় দিয়ে উঠলো।

আমার নিস্পলক দৃষ্টিতে ইফতেখার বিব্রত হলো, কাশি দিয়ে বললো, 'ভাবী, আমি ইফতেখার, আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে ভালো লাগলো।' আমি লজ্জায় মাথা নামিয়ে বললাম, 'জ্বী, আমি একটু ভিতর থেকে আসি।' ভীত হরিণীর মতো ওর সামনে থেকে পালিয়ে এলাম। রুমে এসে মেয়ে অনিন্দিতাকে বললাম যে, ড্রয়িং রুমে আঙ্কেল আছে কথা বলো, আমি আসছি।' বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বেসিন কেবিনেটের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম, আমার গাল লাল হয়ে

গেছে, চোখ দু'টি উদ্ভ্রান্ত, কপালে ঘাম দরদর করে কানের পাশ দিয়ে পড়ছে, আমার হাত কাঁপছে। আমি মনে মনে ওকে জিজ্ঞেস করছি, 'তুমি কেন এলে?' মুখে, ঘাড়ে, গলায় পানি দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে স্বাভাবিক হয়ে রান্নাঘরে গিয়ে কাজের মেয়েটিকে চা বসাতে বললাম। ফ্রিজ খুলে কাবাব বের করে ভাজলাম, ন্যুডলস বানিয়ে ট্রেতে করে নিজেই নিয়ে এলাম।

ড্রয়িং রুমে বাপ-বেটি জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে ওর সাথে। ঘন্টাখানেক আড্ডা দিয়ে সেদিন ও বিদায় নিলো। পুরোটি সময় আমি আর ওর চোখে সরাসরি তাকাতে পারি নি। যাবার বেলায় শুধু বললাম, 'আবার আসবেন, খুশী হবো।'

পরের সপ্তাহের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইফতেখার এলো, শরীফ আসতে পারেনি কি যেন কাজ পড়েছে। এবার আমার তেমন ভয় নেই, মেয়ের জন্য চকোলেট নিয়ে এসেছে, মেয়ে সেটা নিয়ে দীদার কাছে চলে গেলো। ও অনেকক্ষণ ছিল, নিজের কথা বললো, অনেক পরিশ্রম করে ফ্যাক্টরি দাঁড় করিয়েছে সেটা বললো; ওর আরেকজন অংশীদার আছে, বনিবনা হচ্ছে না সেটাও বললো। গড়ুগড় করে বলে যাচ্ছে আর আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছি। ওর কথা বলার বিশেষ ভঙ্গী আছে, মনে হয় মাঝখানে আমি কিছু বললে সেটি থেমে যাবে। ও একসময় বললো, 'ভাবী, আমি তো একাই বলে যাচ্ছি, আপনি কি ভাবছেন!'

'না না বলেন না, আমার শুনতে ভালো লাগছে,' আমি জানালাম। সেদিন ওকে আর ডিনার না করে যেতে দেই নি। রাতে শরীফকে জানালাম যে, 'ইফতেখার এসেছিলেন,' শরীফ নিরাসক্তভাবে উত্তর দিলো, 'তাই!'

এরপর থেকে ইফতেখার মাঝে মাঝেই আসতো। আমিও ওর আসার অপেক্ষায় থাকতাম। সেদিন ছিল সোমবার, পূর্ণিমা তিথি, ইফতেখার দেরী করে এসেছে, প্রায় দশটা বাজে, মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছে, আমার শ্বাশুড়িও শুয়ে পড়লেন। ও বললো যে, 'দেরী করে ফেলেছি, ফ্যাক্টরিতে কাজের চাপ ছিল, দুঃখিত।' আমি বললাম, 'না কিছু হয় নি তাতে।'



আমাদের বাসাটি নিকুঞ্জের এককোণে, দক্ষিণে আর পূর্ব দুটি চারতলা দালান আছে, বাকি দিকে খোলা, উত্তরে বিমানবন্দর, পশ্চিমে বিশাল জলাশয়। ইফতেখার বললো যে, 'চলেন আমরা ছাদে গিয়ে গল্প করি, আজ পূর্ণিমা, আকাশে গাঢ় কমলা রঙের চাঁদ উঠেছে, মনে হয় আপনার ভালো লাগবে।' আমি একটি পাটি নিয়ে ছাঁদে পেতে দিলাম। উত্তরে বিমানবন্দরের রানওয়েতে আলোর বন্যা, তার খানিকটা আমাদের এই ছাঁদ পর্যন্ত পৌঁছেছে, সে আলো ছাপিয়ে পশ্চিম আকাশের পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় চারদিক যেন ভেসে গেলো, জলাশয়ে চাঁদের প্রতিচ্ছবি মৃদু ঢেউয়ে কাঁপছে। আগুনের তাপে যেমন মোম গলে পড়ে, আমার ভিতরটাও তেমনি ওর জন্য গলে পড়ছে। আমরা দুজন পাশাপাশি বসে চাঁদের আলোয় অবগাহন করছি নিঃশব্দে, যেন কোন কথা, কোন শব্দে এই মুহূর্তটি হারিয়ে যাবে। কতক্ষণ যে বসে ছিলাম জানি না, একসময় দেখলাম ও আমার হাত মুঠোয় ভরে নিয়েছে, আমি ওর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিলাম।

ইফতেখার দু'হাতে আমার মুখটি তুলে ধরলো, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' আমি ওর বুকের ভিতরে মাথা গুঁজে বললাম, 'আমিও, তুমি এত দেরী করে কেন এলে?' ধীরে ধীরে আমি ওর ভিতরে আরও সেঁধিয়ে গেলাম, ও আমাকে জড়িয়ে রাখল, ওই পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় স্নান করে আমি ওর কাছে আমাকে সমর্পণ করলাম। ভয়, জড়তা, দ্বিধা কোনো কিছুই আমার ভিতরে কাজ করে নি। আমি সব তৃষ্ণা, আর সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে ওকে গ্রহণ করলাম। রমণক্লান্ত, পরিতৃপ্ত আমি ওর পাশাপাশি শুয়ে থাকলাম মধ্যরাত পার হয়ে আকাশ প্রায় ফর্সা হওয়া অবধি। ইফতেখারই একসময় বললো, 'চলো এবার যাই, আশপাশের সবাই জেগে উঠবে।' অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও নিচে নেমে ওকে বিদায় দিলাম।

সেই থেকে শুরু। ও আমার নাম দিয়েছিল 'টুনটুনি'। প্রায় চার বছর আমরা নিজেদের আবিস্কার করেছি, প্রতিমুহূর্তে আরো বেশী করে ভালোবেসেছি। ওর ফ্যাক্টরির সমস্যায় এমনকি শরীফের কাছে থেকে জোর করে টাকা এনে ওকে দিয়েছি।

কখনও কখনও দুজনে লং ড্রাইভে গিয়েছি। যখন মেয়েকে সাথে নিয়েছি, আমরা একটু সংযত থাকতাম। আর যখন কেবল দুজনে গিয়েছি তখন সন্ধ্যা হলেই গাজীপুরের জঙ্গলে গাড়ী ঢুকিয়ে পিছনের সিটে নিজেদের নিয়ে রমণে মত্ত হয়েছি। গাড়ী চলতে চলতে ওকে চুমু দিয়েছি, কতবার যে দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি। এরপরেও আমি সবসময় ওর মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে চেয়েছি।

আমাদের এই সম্পর্ক সবার জানাজানি হলে, আমি মোটেও বিচলিত হই নি। ইফতির স্ত্রী শরীফকে অভিযোগ করলেন; শরীফ আমাকে শুধু বললো, 'বাড়াবাড়ি কোরো না, তোমার মেয়ে আছে, অন্যের সংসার ভেঙো না।' আমি বললাম, 'আমাদের এমন কিছুই হয় নি, আমরা ভালো বন্ধু, তুমি তো থাকো না, ইফতেখার সাহেব মাঝে মাঝে এসে আমাকে সময় দেন।' শরীফ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'সীমা লংঘন কোরো না।' সেদিন আমি খেপে গিয়ে ওকে যাচ্ছে তাই গালিগালাজ করেছি। আমার উন্মত্ততা, ক্রোধ আর অকথ্য ভাষা শরীফ নিতে পারে নি, ও জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। আমি তাড়াতাড়ি পানি ঢেলে ওর জ্ঞান ফেরালাম, বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওর পাশেই শুয়ে থাকলাম। ওই দিনের পর থেকে শরীফ আমাকে আর কখনও কিছু বলে নি। এমন কি সংসারের জরুরী কথা ছাড়া আর কোন কথা বলতো না। ঢাকায় এলে নিজের ঘরে আপন মনে থাকতো, মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। আমি আছি কি নেই এই বিষয়ে আর কোনো কিছু জানতে চাইতো না।

ইফতির সাথে আমার সম্পর্ক গাঢ় হলো। আমি ওকে জানালাম যে শরীফকে ডিভোর্স দিয়ে ওকে বিয়ে করতে চাই। ইফতি কিছুদিন সময় চাইলো, বললো যে ওর ব্যবসায় একটু ঝামেলা চলছে, ঝামেলাটি মিটে গেলেই ও আমাদের সম্পর্ক চূড়ান্ত করে ফেলবে।

এক সপ্তাহান্তে শরীফ বাসায় এসেছে, ওর আসার কথা ছিল না। এদিকে আমি ইফতিকে আসতে বলেছি, বলেছি যে ও আজ এখানেই আমার কাছে থাকবে। ইফতি ওর বাসার সমস্যার কথা বলছিল, আমি ওকে শুধু বলেছি তোমাকে একজনকে বেছে নিতে হবে, হয়



আমি নয় তো তোমার স্ত্রী। শরীফ চলে আসায় আমি বিপাকে এবং বিরক্ত। তারপরেও সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইফতি এলে আমার ঘরে থাকবে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গড়িয়ে রাত হয়ে এলো, আমি ওকে বারবার ফোন দিয়ে যাচ্ছি, ও কেবল বলছে, 'আসছি, একটু অপেক্ষা করো টুনটুনি।' রাত দশটার পরে ওর ফোন বন্ধ পেলাম। আমি ছটফট করছি, বারান্দায় যাই, জানালার গ্রিল ধরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি, ইফতি আর আসে না।

এগারোটার দিকে শরীফ আমার ঘরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'একটা দুঃসংবাদ আছে, ইফতির গাড়ী ট্রাকের সাথে মুখোমুখী দুর্ঘটনায় পড়েছে, সম্ভবত ইফতি বেঁচে নেই।' আমি চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারালাম। যখন জ্ঞান ফিরে পেয়েছি তখন সকাল, আমি ওর কাছে যেতে চাইলাম। শরীফ আমাকে বোঝালো, 'ইফতির স্ত্রী আর পরিবারের লোকজনেরা আছে, এখন ওখানে তুমি গেলে ভালো হবে না।' শরীফের এক চাচাতো ভাই সেদিন এসেছিলেন, উনি কেন যেন রয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও আমাকে বোঝালেন। আমাকে ওরা আর ইফতিকে দেখতে যেতে দিলেন না।

'আচ্ছা, বলেন তো, আমি যাকেই ভালোবাসি, সেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যায় কেন? আমি আর কতকাল একলা থাকবো? আমাকে কেউ ভালোবাসবে না? কেউ কি আমাকে সারাটি জীবন তাঁর বুকে জড়িয়ে রাখবে না?'

হাসান টুনটুনির এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না। ও টুনটুনিকে জড়িয়ে ধরে রাখলো, টুনটুনি নীরবে কাঁদছে।

'আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়নে রে!
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়নে রে।
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল,
বসন্ত যাবে চলিয়া!
কত উদিবে তপন আশার স্বপন,

প্রভাতে যাইবে চলিয়া!
এই যৌবন কত রাখিন বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে!
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



## ৩০

হাসান ওর অফিসে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গলফ মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে, ওই সবুজ প্রান্তর ওকে ভীষণ টানে। ওর এক বন্ধু প্রতিদিন ভোরে গলফ খেলতে যায়, মাঝে মাঝে ওর সাথে খেলা নিয়ে গল্প করে। হাসানের ইচ্ছে করে যদি সেও যেতে পারতো। কিন্তু ও জেনেছে ওই ক্লাবের সদস্য হওয়া খুব কঠিন আর ব্যয়সাধ্য; এ সময়ে ও পারবে না। তবে হয়তো কোন একদিন সদস্য হবে। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে, সরাসরি জানালার কাঁচ ভেদ করে তপ্ত আলোকরশ্মি হাসানের মুখে এসে পড়ছে, তাঁতিয়ে উঠছে ওর মুখমণ্ডল, বিন্দু বিন্দু ঘাম চিক চিক করছে কপালে। হাসান অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছে, সাবান জলের বুড়বুড়ি যেমন ইচ্ছে মতো ভেসে বেড়ায়, ওর ভাবনাগুলো এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে।

ওর কাজটি সফল হয়েছে। হাসান, ফাহমিদা আর অনামিকাকে কথা দিয়েছে থাইল্যান্ড বেড়াতে নিয়ে যাবে। পরিকল্পনা করা শেষ, ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও জমা করেছে, এখন ভিসা পেলেই উড়াল দিবে। এই ভাবনাগুলো ছাপিয়ে টুনটুনির মুখ ভেসে উঠছে; টুনটুনির কষ্ট, দীর্ঘশ্বাস, আর অপেক্ষার মুহূর্তগুলো হাসানকে পীড়া দেয়। হাসান বুঝতে পারে যে টুনটুনি হাসানের মনের গহীন কোনে একটু জায়গা করে নিয়েছে। সেটির স্বরূপ ও এখনো বুঝে উঠতে পারছে না। টুনটুনির ফোনের জন্য অপেক্ষা করা, অনেক সময় ধরে কথা বলা, মাঝ রাতে ফাহমিদাকে ফাঁকি দিয়ে ফিসফিস করে কথা বলা, সারা দিন ধরে ভাইবারে ক্ষুদে বার্তা পাঠানো, এসব মিলিয়ে হাসান বিভ্রান্ত। ও কি টুনটুনিকে করুণা করছে? না কি ওর শূন্যতার আর্তনাদ হাসানকে আর্দ্র করে তুলেছে? হাসানের জীবনে টুনটুনি অন্যরকম আলো; জীবনের উচ্ছ্বাস, গতানুগতিকতার বাইরে যাবার তাড়না হাসানের স্বাভাবিক জীবনের গতি, সীমারেখা পাল্টে দিচ্ছে। তবে এটুকু বুঝেছে টুনটুনি ভীষণ স্বাধীনচেতা, নিজেকে নিজের মতো করেই ভাবে, অন্যের ভাবনা-চিন্তা তাঁকে মোটেও ভাবায় না। ভাবতে ভাবতেই টুনটুনির ফোন এলো, 'কি করছেন?'

‘এই তো, ভাবছি।’

‘কি ভাবছেন?’

একটু ইতস্তত করে হাসান বলে, ‘আপনাকে নিয়েই ভাবছি।’

‘তাই! এতো ভাবতে হবে না। আপনি কি সামনের শুক্রবার ব্যস্ত?’

‘কেন?’

‘আপনার সাথে শরীফের পরিচয় হয় নি। ও তো বৃহস্পতিবার আসবে, শনিবার চলে যাবে। শুক্রবার সন্ধ্যায় আমাদের সাথে ডিনার করেন, ভাবীকে নিয়ে আসবেন, আমরা খুবই খুশী হবো।’

‘ঠিক আছে, তবে ফাহমিদা তো আপনাদের কথা জানে না। আচ্ছা, আমি বাসায় কথা বলে আপনাকে জানাই।’

‘ওকে, বাই।’

হাসান নিজের চেয়ারে বসে খানিক ভাবলো, ফাহমিদাকে কিভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করবে। নারীদের তৃতীয় নয়নে অনেক কিছুই ওরা বুঝতে পারে। হাসান টুনটুনিকে ফোন করে বললো, ‘আপনি কি সগীর ভাইকেও বলেছেন?’

‘বলিনি, আপনি চাইলে বলবো, আমি বুঝেছি।’

হাসান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফাহমিদাকে ফোনে করে জানালো যে সগীর ভাইয়ের বন্ধু শরীফ সাহেবের বাসায় ওদের শুক্রবার সন্ধ্যায় ডিনারের আমন্ত্রণ আছে। ফাহমিদা মৃদু আপত্তি তুললো, ‘আমি তো ওদের চিনি না।’ ‘সে জন্যই যাওয়া, গেলেই তো পরিচয় হবে’, হাসান উত্তর দিলো। দোনমনা করে ফাহমিদা রাজী হলো।

হাসান টুনটুনিকে ফোন করে নিশ্চিত করলো আর অনুরোধ জানালো যেন হার্ড ড্রিঙ্কস না থাকে। ‘কেন, ভাবীর আপত্তি আছে?’ টুনটুনির প্রশ্ন। ‘হ্যাঁ, এবিষয় ওর অত্যন্ত অপছন্দের,’ হাসান জানালো। আরো টুকটাক কথা বলে ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে, হাসান আবারো গভীর ভাবনায় ডুবে গেলো। ওর আর টুনটুনির সম্পর্কের মিথষ্ক্রিয়াটি ও এখন আড়ালেই রাখতে চায়।



সন্ধ্যায় আটটার একটু পরে ওরা টুনটুনিদের নিকুঞ্জের বাসায় পৌঁছে গেলো। শরীফ সাহেব আগের বাসায় নেই, ওরা  দুটো লেইন পরে নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে, আজকের আমন্ত্রণ সে উপলক্ষে। তিনতলায় কলিং বেল বাজাতে দরজা খুলে দিয়ে সাদর সম্ভাষণ জানালেন শরীফ সাহেব। সবাই মিলে ড্রয়িং রুমে বসলো। ওখানে আগে থেকেই আরো কয়েকজন বসে ছিলেন। একজনকে ওরা আগে থেকেই চিনে, ওর বন্ধু সগীর, অন্যেরা অচেনা। শরীফ নিজে থেকেই পরিচয় করিয়ে দিলো, ‘ভাবী, আমি শরীফ, উনি সগীর ভাই, আর ইনি আহমেদ ভাই, এই পাশে আমার ভাগ্নীজামাই মিলন, ওর পাশে আমার বন্ধু তপন মাঝে মাঝে টেলিভিশন পর্দায় উঁকিঝুঁকি দেয় আর কি; আপনার বসেন আমি আনাকে ডেকে নিয়ে আসি, ও বোধো হয় রান্নার তদারকিতে ব্যস্ত।’

ফাহমিদা ড্রয়িং রুম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, দরজা দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর কাঁচ আর কাঠের দেয়াল তুলে ডাইনিং রুম আর ড্রয়িং রুমকে পৃথক করে অপরিসর ফয়ার তৈরি করা হয়েছে। ফয়ারে কাঠের দেয়ালে জুতো রাখবার ব্যবস্থা আর উল্টো দিকের ইটের দেয়ালটিতে গ্রামীন বাংলার তৈলচিত্র। দরজা বরাবর ড্রয়িং রুমে প্রবেশের রঙিন কারুকাজ করা কাঁচের দরজা, কাঠের ফ্রেম পুরোটাই ঘন কালচে-বাদামী, পাশের জায়গাটুকুতেও কাঠ-কাঁচের দেয়াল যার বাইরের দিকটিতে দরজার মতই রঙিন কারুকাজ, ভিতরের দিকটিতে বিভিন্ন আকারের খোপ বানানো যেখানে সুন্দর শো-পিস সাজিয়ে রাখা আছে। পূর্বদিকে দেয়াল জুড়ে কাঁচের জানালা, উত্তর আর পূর্বদিক ঘেসে কালো নরম সোফা, দক্ষিণের দেয়ালে হোম থিয়েটারসহ বিশাল টেলিভিশন, যার দু'পাশে দু'টি ফ্রেমে বাঁধানো পারিবারিক ছবি। ছাঁদে দুই স্তরের ফলস সিলিং দিয়ে আলো তীব্রতা কমিয়ে আনা হয়েছে, একটু পরপর আলোর রঙ বদলে যাচ্ছে লাল, সবুজ, নীল, সাদা। সবমিলিয়ে ফাহমিদার ভালো লেগেছে এটা হাসান বুঝলো। তবে আলোর রঙ বদলানোর বিষয়টি পছন্দ হয় নি সেটি আবার ফিসফিস করে বলে ফেললো।

ড্রয়িং রুমের দুরজা খুলে রিয়ানা ভিতরে এসে ফাহমিদাকে জড়িয়ে ধরলো, ‘ভাবী, আমি রিয়ানা, আপনি এসেছেন, আমাদের ভীষণ ভালো

লাগছে। ওমা, এটি কে? তুমি অনামিকা? ভাবী, চলেন ভিতরে যাই, আমরা ওখানে গল্প করি, আরো অনেকে আছে।' রিয়ানা আজকে একটু আটপৌরে সেজেছে, হলুদ সালওয়ার-কামিজ, কামিজে কাঁচের বুটি বসানো, কনুই থেকে কবজি আর বুকের মাঝ থেকে হেম পর্যন্ত সুতোর কাজ, হাত ভরা চুড়ি, কপালে লাল বড় টিপ, লাল লিপস্টিক, নাকের একপাশে বড় বাহারী পাঁথরের নাকফুল, অন্য পাশে ছোট হীরের নাকফুল; হাসান ভয়ে ভয়ে একবারের বেশী দু'বার দেখলো না।

ওরা ভিতরে চলে গেলে হাসানের আড়ষ্টতা কেটে গেলো। আহমেদ সাহেবের সাথে আলাপচারিতা জমে উঠলো, ভদ্রলোক ব্যবসায়ী, পঞ্চগড় থাকেন, পাথর কোয়ারী আছে সাথে বাংলোসহ বাগান করেছেন। আহমেদ সাহেব পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন বেশ আগেই, স্ত্রী ছেলে-মেয়েরা ইংল্যান্ডে থাকে, ওরা বছরে একবার কি দু বার দেশে আসেন।

'ভাই, আসেন আমার এখানে বেড়িয়ে যান, আপনার তো ফ্যামিলি ছোট আছে, এখন বেড়ানোর সময়, আমার মত বুড়া হয়ে গেলে তো আর পারবেন না।' আন্তরিকভাবেই আহমেদ জানালেন। হাসান সম্মতি জানালো যে অবশ্যই যাবে। ওই দিকে সগীর, মিলন আর তপনের সাথে মিডিয়াজগতের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন।

'শরীফ, তুমি দাওয়াত দিলা, পানি কই?' আহমেদ ভাইয়ের জিজ্ঞাসা। শরীফ বিব্রত, বলতে পারছে না আসল ঘটনা। শরীফের অসহায়তা থেকে সগীর উদ্ধার করলো, 'ভাই, ভাবীরা-বাচ্চারা আছে, আমরা না হয় ডিনারের পরে বসি।' এর মধ্যে আনা এসে জানালো যে ভাবীরা-বাচ্চারা নিয়ে নিয়েছে এবং সবাইকে টেবিলে আসার অনুরোধ করলো। আহমেদ সবার সামনেই রিয়ানার হাত ধরে বললেন, 'এই তুমি যে ভিতরে পালায়া গেলা আর আসলা না, ঘটনা কি? আর জামাইকে বইলা দিছ পানি না রাখতে?'

রিয়ানা হঠাৎ আক্রমণে অপ্রস্তুত, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'ধ্যাৎ! আহমেদ ভাই, আপনি মুরব্বী, সবার সামনে কি করেন না! চলেন তো টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' হাসান অবাক হয়েছে



তবে ওর বিস্ময় লুকিয়ে রাখলো। আহমেদ ডাইনিং রুমের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'হাসান ভাই, কিছু মনে কইরেন না, অগো তো আরো ছোটো থাইকা চিনি, একটু আদর করি আর কি।'

টেবিলে অনেক আয়োজন, মোগলাই ঘরানা থেকে শুরু করে চাইনিজ, থাই ক্যুইজিন সবই আছে। ওরা প্লেটে পছন্দমত খাবার নিচ্ছে। হাসান লক্ষ্য করলো রিয়ানা ওর সাথে সম্মানজনক দূরত্ব রেখে আচরণ করছে। আহমেদ ভাই অল্পই খান, তিনি সবার আগেই ড্রয়িং রুমে ফিরে গেলেন, ওনার সাথেই আরেকটু নেওয়ার অনুরোধ জানাতে জানাতে রিয়ানা গেলো। হাসানও অল্প করে প্লেটে নিয়ে ড্রয়িং রুমে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, রিয়ানা আহমেদ ভাইয়ের খুব কাছে দাঁড়ানো, আহমেদ ভাইয়ের এক হাত রিয়ানার গালে, রিয়ানা সেটি ধরে আছে। আহমেদ ভাইয়ের নজর দরজার দিকে যেতে হাত নামিয়ে বললেন, 'ভাই আসেন।' রিয়ানা হাসানের দিকে তাকালো কিন্তু বুঝতে পারেনি হাসান কতটুকু দেখেছে বা কি দেখেছে। ও অন্য অতিথিদের দেখবার জন্য ত্রস্ত পায়ে চলে গেলো। হাসান খাবার নিয়ে সোফায় বসে অন্যমনস্কভাবে খেতে থাকলো, খাবারগুলো প্লেটের এপাশ-ওপাশ ঘুরতে থাকলো। একসময় উঠে গিয়ে টেবিলে প্লেট রেখে এলো। রিয়ানার বারবার অনুরোধে জানালো ওর খাওয়া হয়ে গিয়েছে, ও আর বেশি নিতে পারবে না। হাসানের কণ্ঠের দৃঢ়তায় রিয়ানার মুখ মলিন হয়ে এলো, বুঝলো যে হাসানের মন ভালো নেই, খুব মিনতি করে বললো, 'একটু ডেজারট নেন।' হাসান রিয়ানার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনার অন্য অতিথি আছে, আমি যা নেবার নিয়েছি।'

হাসান ড্রয়িং রুমে এসে সেলফোনের হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন গ্রুপের ক্ষুদে বার্তা দেখতে থাকলো। আলাপে আর ওর মন নেই। শরীফ একবার এসে বার বার কিছু নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে সাড়া না পেয়ে ফিরে গেলো। হাসান শরীফকে বলল, 'দেখেন তো ভাই ভাবীদের হলো কিনা, মেয়েটার কাল সকালে স্কুল আছে।'

রিয়ানা ড্রয়িং রুমে ফিরে এসে বললো, 'চলে যাবেন এখনি, রাত বেশি হয় নি তো।' ওর পিছনেই ফাহমিদা আর অনামিকা। হাসান

বললো, 'জ্বী, ভাবী, অনামিকার কাল সকালে স্কুল আছে।' ফাহমিদা অবাক হয়েছে, হাসানের কণ্ঠে রাগের ধার। ফাহমিদা বললো, "সরি, ভাবী, আজকে আমরা আসি, আবার আসবো। আপনাদেরও দাওয়াত থাকলো।'

বাড়ী ফেরার পুরোটি সময় হাসান চুপচাপ গাড়ী চালিয়েছে। ফাহমিদা একবার কথা বলার চেষ্টা করে হাসানের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেছে, পিছনে অনামিকা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। বাসায় ফিরে যে যার মত ফ্রেশ হচ্ছে, ফাহমিদা একটু সময় নিবে, মেকআপ তোলার জন্য মেয়েদের বেশ ভালো সময়ই লাগে, অনেকগুলো পলেস্তারা তুলতে হয়। ভাইবারে টুনটুনির ক্ষুদে বার্তা, 'পৌছে গেছেন? এতো তাড়াতাড়ি চলে গেলেন!' হাসান প্রতিউত্তর না করে ক্ষুদে বার্তাটি মুছে দিলো।

ঘরের টুকটাক কাজ করে মাঝ রাতে হাসান ফাহমিদাকে কাছে পেলো, ওর মৃদু আপত্তি, 'বাইরে থেকে এসেছি, টায়ার্ড লাগছে, আজ থাক।' হাসান ওর আপত্তি না শুনে প্রবল আবেগে ওকে আদর করলো, ফাহমিদা সাড়া দেয় নি, বাঁধাও দেয় নি, একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বলেছে, 'আস্তে, ব্যথা পাচ্ছি তো।' রমণক্লান্ত হাসান সোজা হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ফাহমিদা ওর দিকে ফিরে খুব মায়া ভরে হাসানের গালে হাত রেখে বললো, 'তোমার মন খারাপ? আমার কাছে আসো'—ওকে টেনে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ওর বুকের নরোম উষ্ণতায় মাথা গুজে হাসান কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টের পায় নি।



## ৩১

'হয়তো তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি
নয় তো গিয়েছি হেরে
থাক না ধ্রুপদী অস্পষ্টতা
কে কাকে গেলাম ছেড়ে।' —হেলাল হাফিজ

হাসান মেয়েকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে অফিসে এসেছে। শনিবার কাজের চাপ কম থাকে। এদিনে অফিস স্টাফদের নিয়ে সামনের সপ্তাহে কি কি টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে হবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়, অসমাপ্ত কাজগুলো গুছিয়ে নেয়, এরপরেও ওর হাতে বেশ সময় থাকে। ম্যানেজার জানালেন থাইল্যান্ডের ভিসা হয়ে গেছে, সোমবার ফ্লাইট বুকিং দিয়েছেন, হাসান নিশ্চিত করলে উনি পেমেন্ট করে ই-টিকেট নিয়ে নিবেন।

হাসান বললো, 'বাসায় কথা বলে জানাচ্ছি, আর হোটেল অ্যাম্বাস্যাডরে তিন দিনের বুকিং দিবেন ফ্যামিলি রুম, বাকিটা আমি দেখবো।' ম্যানেজার বিদায় নিলে ও ফাহমিদাকে ফোন করে জানালো যে ভিসা হয়ে গেছে ওরা সোমবার যাচ্ছে। ফাহমিদা বললো, 'এই দু'দিনে কিভাবে গুছাবো?' 'সাতদিন থাকবো এমন করে গুছিয়ে নাও, আর আমি তো সন্ধ্যায় বাসায় আছি, তোমাকে হেল্প করবো', হাসান উত্তর দিল। 'তুমি কি হেল্প করবা আমার জানা আছে, রাখি অনেক কাজ আছে বলে,' ফাহমিদা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলো।

আজ গলফের মাঠে অনেক ভিড়, ছুটির দিনে এমনটি হয়, বিশেষ করে বেশ কিছু বিদেশীদের দেখতে পাচ্ছে। গ্রীন, ফেয়ারওয়ে, টি-অফ সব স্থানেই গলফারদের ভীড়। সকালে শীতের আমেজ টের পাওয়া যায়। পশ্চিমে হেলে পড়া গলফারদের ছায়াগুলো যখন ছোট হয়ে আসে, রঙিন ছাতাগুলো ওরা মেলে ধরে তখন ওই সবুজ প্রান্তর আরো প্রাণবন্ত সজীব মনে হয়। ওপর থেকে চলমান রঙিন বৃত্তগুলো দেখে ওর একটি ডকুমেন্টারিতে দেখা কোষবিভাজন আর সংযোজনের দৃশ্য মনে পড়লো। রঙিন বৃত্তগুলো একটু পরপর কাছাকাছি আসছে আবার দূরে

সরে যাচ্ছে। ফোনের আওয়াজ ওকে ডেকে ফিরিয়ে আনলো, টুনটুনির ফোন। হাসান চেয়ারে বসে ফোনটি দেখছে, বেজে যাচ্ছে, অনেকবার বেজে থেমে গেলো। ক্ষুদে বার্তা ফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠলো, 'জানি না কি হয়েছে, আপনি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন।' হাসান ক্ষুদে বার্তাটি মুছে দিয়ে গলফ মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে, ও ডুবে গেছে ওর মনের গভীরে। প্রায় বছর দেড়েক হয়েছে টুনটুনির সাথে ওর পরিচয়, সেই ক্লাব থেকে শুরু করে কাল টুনটুনির বাসায় ডিনার অবধি অনেকটা পথ দুজনে পেরিয়েছে। হাতির ঝিলে দুজনে পাশপাশি দাঁড়িয়ে থাকা, ওর শুটিং থেকে অনেক রাত করে ফেরা, হাসানের অফিসে টুনটুনির আগ্রাসন, ছোটো ছোটো কথা, ওর হাসি, ওর ছোঁয়া, থুতনীর সেই ভাঁজ, শরীফের কথা বলতে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে টুনটুনির বাঁধভাঙ্গা ক্রন্দন, ইফতির জন্য হাহাকার এসব হাসানের মনের পর্দায় সেলুলয়েডের ফিতার মতো ভেসে উঠছে। ওর মনের গহীন কোনে টুনটুনি স্থান করে নিয়েছে। কালকের সন্ধ্যায় ওদের ড্রয়িং রুমে টুনটুনির গালে আহমেদ ভাইয়ের হাত টুনটুনির ধরে থাকা সেই স্থানের সামনে যেন কালো পর্দা ঝুলিয়ে দিলো। কেবল এই ফ্রেমটি স্থির হয়ে আছে, আর কিছুই হাসান দেখতে পাচ্ছে না।

আমি কি কেবলই ওর দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নেবার বন্ধু? আমি কি ওর কাছে প্রদর্শনীয় বস্তু? যেখানে চাইবে সেখানে যাবো, পরিচয় করিয়ে দিবে, দেখাবে যে তাঁর একজন তারুণ্যদীপ্ত, বিত্তশালী, সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন কাছের মানুষ আছে? যদিও হাসান নিজেকে বিত্তশালী মনে করে না। টুনটুনি কি চাইছে ওর কাছে? ওর উচ্ছলতা, যৌবনের উচ্ছ্বাস, জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, ওর সরলতা সব কিছু মিলিয়ে ওর সঙ্গ হাসানের ভালো লাগে। তাহলে কি আমি ঈর্ষান্বিত? গতকালের সেই ছবি কি তাহলে আমার মনের অনুভূতিকে আঘাত করেছে? আমার কাছে সম্পর্কের স্বচ্ছতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সেটা আমি যে অবস্থানেই থাকি না কেন। হাসান ভাবছে, কিন্তু ওর আর টুনটুনির সম্পর্কের স্বরূপ এখনও বুঝে উঠতে পারছে না। অস্পষ্ট এই সম্পর্ক, তার গভীরতা, তার সীমারেখা, তার ব্যাপ্তি কোন কিছুরই সীমানায় পৌঁছাতে পারছে না



হাসান। বুঝতে না পারার এই অক্ষমতা, ওর ভিতরে ঈর্ষা ছাপিয়ে ক্রোধের জন্ম নিচ্ছে। ও হাতের কাছের পানির গ্লাসটি মেঝেতে ছুড়ে মারলো।

গ্লাস ভাঙার আওয়াজে পিয়ন কবির দৌড়ে এলো, 'স্যার?' ওর চোখে জিজ্ঞাসা, সাহস পাচ্ছে না বলার। 'কিছু হয় নি, গ্লাসটি পড়ে গেছে, পরিষ্কার কর,' বলে হাসান জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কবির ভাঙা কাঁচের গ্লাস পরিষ্কার করে চলে গেলে দরজাটি বন্ধ করে হাসান নিজের চেয়ারে ফিরে এলো। ভাবনার সুতো আবারো এলোমেলো হয়ে গেছে, তবে একটা বিষয় বুঝতে পারছে এই দেড় বছরে ফাহমিদার সাথেও সূক্ষ্ম দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, ফাহমিদার চোখের আলো অনেকটাই ম্লান, অভিযোগ করে না, কিন্তু ওর নীরবতা, চোখের ভাষা বুঝিয়ে দেয়।

হাসান নিজের মাথা টেবিলে ভাঁজ করা হাতের উপর নামিয়ে আনে, নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। টেবিলের কাঁচের উপর দিয়ে ওর চোখের জল সরু নালা সৃষ্টি করে টেবিলের ধার ঘেসে কাঁচের নিচে ঢুকে যায়, কয়েক ফোটা কাঠের প্রান্ত ধরে ঝুলতে থাকে অনন্তকাল।

## ৩২

দুপুর একটার সময় চেক-ইন শেষ করে বিমানে উঠার জন্য ওরা সবাই অপেক্ষা করছে, ফাহমিদা আর অনামিকার জন্য প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। ভীষণ উত্তেজনা আর আনন্দের মধ্যে আছে ওরা দু'জন, বিশেষ করে অনামিকা। অনেক প্রশ্ন অনামিকার, 'বাবা এর পরে কি হবে? প্লেনে উঠে কার্টুন দেখা যাবে? আমরা কখন পৌছাবো? ওখানে কয়টা বাজবে তখন?' ফাহমিদা চিন্তিত লাগেজ নিয়ে, ওগুলো যে আলাদা দিয়ে দিলাম এই ফ্লাইটে নিবে তো? প্রশ্ন জর্জরিত হাসান ওদের টানটান উত্তেজনা সামলে দেড়টায় বিমানে উঠলো সবাইকে নিয়ে।

'বাবা, আমি জানালার পাশে বসবো,' অনামিকার আবদার হাসিমুখে সম্মতি দিয়ে হাসান কড়িডোরের পাশের আসনে বসলো। নিয়মমাফিক সকল নির্দেশনা বলার পর বিমানের ক্যাপ্টেন ঘোষণা দিলেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি উড়াল দিবে ব্যাংককের উদ্দেশে। অনামিকা তখন বললো, 'বাবা, তোমার মোবাইল বন্ধ কর, ক্যাপ্টেন আঙ্কেল বলেছে।' হাসান ওর মোবাইলে শেষ ক্ষুদে বার্তা পড়ছিলো, 'আপনার অফিসে এসেছিলাম, শুনলাম ব্যাংকক গেছেন, একবারও জানালেন না! আপনার ভ্রমণ শুভ হোক, টুনটুনি।' হাসান ক্ষুদে বার্তাটি মুছে দিয়ে মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিলো। ফাহমিদা জানতে চাইলে বললো যে শরীফ ভাবী ডিনারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন আর ভ্রমণ শুভ হোক জানিয়েছেন।

'বাবা, মেঘগুলো দেখো, কি সুন্দর লাগছে! একদম তুলোর মতো আর আকাশ এতো নীল!' অনামিকার বিস্ময়। ওর ঘোর কাটে না, 'বাবা দেখো ওই যে আরেকটা প্লেন!' মেয়ের আনন্দ আর উচ্ছ্বাস হাসানকে ছুঁয়ে যায়।

বিকাল পাঁচটায় ব্যাংককের সুবর্ণভূমি বিমানবন্দরে ওরা পৌঁছলো। ইমিগ্রেশন শেষ করে হোটেল অ্যাম্বাসেডরে পোঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা। চেক-ইন করে রুমে গিয়ে হাসান বললো,



'তোমরা ফ্রেশ হয়ে নাও, আমরা ঘন্টাখানেক পরে বাইরে যাবো, আশেপাশেই ঘুরবো।' ফাহমিদা লাগেজ খুলে গুছাতে ব্যস্ত হলো, হাসান মোবাইল ফোন অন করে ওয়াইফাই সংযোগ করে ম্যানেজারকে জানিয়ে দিলো যে ওরা পৌঁছে গেছে।

ওদেরকে নিয়ে নিচে নেমে আসার সময় হাসান ফাহমিদাকে বলছিল, 'ব্যাংকক হচ্ছে পর্যটকদের স্বর্গভূমি, আর আমরা যেখানে উঠেছি এই সুকুমভিত এলাকায় বাঙালিরা বেড়াতে এলে থাকে, দেখবে পরিচিত কারো না কারো সাথে দেখা হয়ে যাবে; এছাড়া আরো কিছু দেখবে কিন্তু দেখেও না দেখার ভান করবে।'

'মানে?' ফাহমিদার জিজ্ঞাসা।

'মানে হচ্ছে, পর্যটকদের আমোদ-প্রমোদের সব ব্যবস্থা এখানে আছে। নাইটক্লাব, বার, সেক্স টয় শপ, রাস্তার পাশে দণ্ডায়মান বারবনিতা, ম্যাসেজ পার্লার। এগুলোকে উপেক্ষা করলে এ শহরটি অসাধারণ বেড়ানোর এবং শপিং এর জায়গা।'

'হুম, বুঝলাম।'

'কি বুঝলে?'

'এখানে তোমাকে একা পাঠানো যাবে না,' ফাহমিদার উত্তর।

হোটেল থেকে বেড়িয়ে ওরা বামে সুকুমভিত সড়ক ধরে এগোতে থাকে, রাস্তার দুপাশেই খাবারের রেস্তোরাঁ, ভারতীয় টেইলরিং শপ, মানি এক্সচেজ, ম্যাসেজ পার্লার। রাস্তার মাথায় সেভেন-ইলেভেন পেরিয়ে আবার বাঁয়ে ঘুরে প্রধান সড়ক ধরে যেতে থাকে যার উপর দিয়ে স্কাই ট্রেন বা মেট্রো রেল যাচ্ছে। 'বাবা, দেখো উপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে!' অনামিকা হাসানের হাত টেনে ধরে দেখায়। 'হ্যাঁ, মা, আমাদের দেশেও হবে; কাল আমরা ওই ট্রেনে চড়বো। অনেক হাঁটা হয়েছে। চলো, কোথাও বসি। কি খাবে তোমরা? দেশী খাবার না অন্য কিছু?' হাসান জানালো।

‘বাবা, ম্যাকডোনাল্ডস-এ যাবো,’ মেয়ের আবদারে মায়ের মৌন সম্মতি। ওরা ‘রবিনসন’ মার্কেটের কাছে ম্যাকডোনাল্ডসে খেয়ে আবারো ওই একই পথে হেঁটে হোটেলে ফিরে এলো।

‘বাবা, কাল আমরা কোথায় যাবো?’

‘কাল আমাদের সকাল নয়টায় বেরিয়ে যেতে হবে। প্রথমে চাও ফ্রায়া নদীতে বোট ট্রিপ নিবো, গ্র্যান্ড প্যালেসের কাছে নেমে সেটি দেখে চলে যাবো সিয়াম ডিসকভারি মলে; ওখানে তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে, এখন বলবো না।’

‘বাবা!’



## ৩৩

লেক সিলম পিয়ার থেকে ওরা চাও ফ্রায়া টুরিস্ট বোটে উঠলো গ্র্যান্ড প্যালেস পর্যন্ত যাবে। নদীর দু’পাশে আধুনিক ব্যাংককের সুরম্য অট্টালিকা আর অসংখ্য সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির; তালাত নই, ঊনবিংশ শতাব্দীর লং ১৯১৯, চৈনিক বৌদ্ধ মন্দির ওয়াত ম্যাঙ্কন কামালাওয়াত, ওয়াত আনংখারান ওয়ারাউইহান বৌদ্ধ মন্দির, ওয়াতফ্রা সেতুফন (শায়িত বুদ্ধ) এবং আরো অনেক মন্দির। আকাশ কিছুটা মেঘলা, সূর্য মেঘের ফাঁকে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, নদীর বুকে বেশ বাতাস বইছে তাতে গরমটি কমে ভালো লাগছে।

নদীর দু’পাশ দেখতে দেখতে হাসান মেয়েকে থাইল্যান্ডের ইতিহাস বলছিল, ‘মা, থাইল্যান্ড যা শ্যাম নামেও পরিচিত। ইতিহাস চার হাজার বছরের বেশি পুরোনো। ধারণা করা হয় যে, এরা দক্ষিণ চীন থেকে এই স্থানে আগমন করে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ‘সুকোথাই’ নামীয় প্রথম থাই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় যা একশত বছর টিকে ছিল। পরবর্তীতে ‘আউথায়া’ নামে যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি বর্তমান কম্বোডিয়া, লাওস, মালয় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাজা ফ্রায়া থাকসিন এই ব্যাংককের ওই পারে ‘থনবুরি’তে নতুন রাজধানী করেন। এরপরে চাও ফ্রায়া চাক্রি তাঁকে সরিয়ে রাজত্ব দখলে নেন এবং তিনি ‘প্রথম রামা’ নামে পরিচিত, তাঁর রাজত্বকালে ব্যাংকক রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। চাও ফ্রায়া চাক্রি, চাক্রি রাজবংশের প্রথম রাজা। রাজা ‘প্রথম রামা’ হতে রাজা ‘চতুর্থ রামা’ পর্যন্ত এই রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। রাজা ‘পঞ্চম রামা’র রাজত্বকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একে একে লাওস, কম্বোডিয়া এবং মালয় হাতছাড়া হয়ে যায়।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে থাইল্যান্ড সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। এরপর অনেক উত্থান পতন, বিদ্রোহ, সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে থাইল্যান্ডের যাত্রা। ১৯৪৬-এ রাজা ভূমিবল আদুলিয়াদেজ শাসনভার গ্রহণ করেন। ২০১৬-এর অক্টোবর মাসে রাজা ভূমিবল মৃত্যুবরণ করেন। একই বছর ডিসেম্বর মাসে রাজা মহা ভাজিরালঙ্করন

চাক্রি বংশের দশম রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। জাতি হিসেবে 'থাই'রা অত্যন্ত অমায়িক, সজ্জন এবং অতিথিপরায়ণ।

মেয়ের সাথে গল্প করতে করতে ওরা গ্র্যান্ড প্যালেসের কাছে ঘাটে পৌঁছলো। গ্র্যান্ড প্যালেসের সব স্থান পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত নয়; টেম্পল অফ এমারেল্ড বুদ্ধসহ আরো কিছু স্থাপনা দেখার সুযোগ মিললো। রাজা 'প্রথম রামা' এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে অন্যান্য রাজাগণ এতে সংযোজন করেছেন, ধর্মীয় স্থাপত্য অনুশাসন মেনে অসাধারণ নির্মাণশৈলী আর কারুকার্য করা। ভিতরে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে পুরোহিতরা ধ্যানে মগ্ন, ধূপ-আগরবাতি জ্বলছে, বুদ্ধ মূর্তির সামনে পূজার নৈবদ্য সাজানো। মন্দিরের ভিতরে ছবিতোলা আর উচ্চস্বরে কথা বলা নিষেধ। সব মিলিয়ে পর্যটক যে ধর্ম আর বর্ণের হোন না কেনো তাঁর মন আর্দ্র হয়ে যায়, শ্রদ্ধাবনত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সবাই।

হাসান ওদেরকে সানাম চাই মেট্রো স্টেশন থেকে চালিওম রাত চামজ্ঞন স্টেশনে এসে লাইন চেঞ্জ করে সিয়াম ডিসকভারিতে নিয়ে এলো। মলে ঢোকার পর অনামিকার উল্লাস, 'বাবা, এজন্যই আগে বলোনি!' ওরা দাঁড়িয়ে আছে 'ম্যাডাম টুসো'র মিউজিয়ামের প্রবেশ পথে।

'আমাদের সময় চারটা থেকে, চলো আগে কিছু খেয়ে শপিং মলটি ঘুরে দেখি,' হাসান জানালো। ওরা লেভেল ফোর এর ফুড কোর্ট 'ফুড রিপাবলিক' এলো। 'এই শোনো, আমরা এখানে থাই খাবার খাবো,' ফাহমিদার সিদ্ধান্তে ওরা একটি থাই রেস্তোরাঁর সামনে বসলো। খেতে খেতে শপিং মল নিয়ে গল্প হলো। হাসান জানালো, 'এই মলে ভালো ব্র্যান্ডের কাপড়, জুতো, ব্যাগ, ঘড়ি ইত্যাদি পাওয়া যায়। তবে তুলনামূলক ভাবে দাম বেশি। আমরা ঘুরে দেখি, পছন্দ হলে কিনবো; এছাড়া আর শপিং মল আছে যেখানে আর দু দিন পরে যাবো। শেষ দু'দিন শপিং এর জন্য রাখা আছে।'

ওরা যথাসময়ে 'ম্যাডাম টুসো' মিউজিয়ামে প্রবেশ করলো। এটি দশটি বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী কক্ষে সাজানো, রাজকীয় কক্ষে বিভিন্ন



দেশের সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, রাজা, রানীদের মানুষ সমান মোমের মূর্তি দেখে সত্যি বলে ভ্রম হয়। বর্তমান বিশ্বের নেতৃবর্গ, ক্রীড়াঙ্গনের নামকরা খেলোয়াড়, অ্যাথলেট; প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, সঙ্গীত ও সিনেমাজগতের তারকামণ্ডলী, সুপার হিরোস কে নেই আর কি নেই! ওরা একেকটি কক্ষ ঘুরে দেখছে আর ছবির পর ছবি তুলছে। অনামিকা বাবা-মাকে রানি এলিজাবেথের পাশে দাঁড় করিয়ে ছবি তুললো, ওর আনন্দ ফাহমিদাকেও আবেশিত করেছে। অনামিকা ওর নিজের ছবি বেশি তুললো সুপার হিরোদের সাথে।

মিউজিয়াম দেখে ওরা যখন বেরিয়েছে তখন রাত নেমেছে, অনামিকা ভীষণ ক্লান্ত। হাসান ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরেছে, অনামিকা ট্যাক্সিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাসান ওকে কোলে করে রুমে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে জুতো, মোজা খুলে দিলো। 'শোনো, আমি ফ্রেশ হয়ে আসি, তুমি রুম সার্ভিসে অর্ডার দিয়ে দাও, ও উঠলে পরে খাবে', ফাহমিদা বলে বাথরুমে গেলো।

হাসান অনামিকার দিকের টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে দিয়ে নিজেদের বিছানায় ফাহমিদার সাথে বসে আজকের তোলা ছবি দেখছে। 'এই তুমি ওর সাথে ছবি তুললে কেন? সাদা মেয়ে আর ব্লন্ড হলে বুঝি মাথা ঠিক থাকে না!' বন্ড গার্ল রোজামুন্ড পাইকের সাথে তোলা ছবি দেখিয়ে ফাহমিদা হাসানের সাথে খুনসুটি করে। ওটা নয় আমার এই বন্ড গার্ল প্রিয় বলে হাসান ফাহমিদাকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে চুমু দেয়। এই কি কর, মেয়ে ওই পাশে তো, ফাহমিদার মৃদু আপত্তি। 'চলো মেঝেতে নেমে যাই', হাসানের প্রস্তাবে ফাহমিদার মৌন সম্মতি। ওরা শয্যার পাশে নেমে এলো এবং প্রবল আবেগে নিজেদের মধ্যে বিলীন হলো।

## ৩৪

পরদিন সকালের নাস্তা সেরে ওরা হোটেলের বাইরে দাড়িয়ে আছে। 'বাবা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?' অনামিকা জিজ্ঞেস করলে হাসান বললো 'অপেক্ষা কর, এখনি জানবে।' এক মিনিটের মধ্যেই সাফারি ওয়ার্ল্ড নামাঙ্কিত বাস এসে থামলো। অনামিকা হাসানকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'বাবা, থ্যাঙ্ক ইউ।'

বাস দশটার সময় সাফারি ওয়ার্ল্ড-এর সামনে এসে থেমেছে। টিকেট কেটে ভিতরে গিয়ে সবাই অভিভূত। প্রবেশপথ থেকেই অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো, বেশ কিছু কার্টুনের অবিকল প্রতিমূর্তি পথের পাশে বসানো। একটা জলহস্তী মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে যেন এখনি গিলে ফেলবে। ওরা প্রথমেই সাফারি পার্ক-এর ট্যুর টি নিলো। প্রায় পাঁচশ একর জুড়ে এই সাফারি পার্ক, হিংস্র প্রাণীগুলো এমনভাবে রাখা যাতে একদিকে পর্যটক নিরাপদে থাকে অন্যদিকে প্রাণীগুলোর বিচরণের যথেষ্ট এলাকা আছে। পর্যটকদের চলাচলের জন্য সর্পিলাকার পিচঢালা পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে বহির্গমন ফটক পর্যন্ত। জেব্রা, উট, হরিণ, ইমু এবং সব ধরনের পাখি নিজের মতই ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ছনের ছাউনী বানানো, রোদের তাপ বেড়ে গেলে বা শ্রান্ত হলে পশুরা ওই ছাউনীর নিচে গা এলিয়ে দেয়। বাঘের এলাকার পাশে ওদের গাড়ী থামতেই অনামিকা বাবার হাত আঁকড়ে ধরলো, 'বাবা, ওরা খাঁচা ভেঙে বেড়িয়ে আসবে নাতো? ওইগুলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার না? বাবা, ওরা গাছের ডালে শুয়ে আছে কেন?'

'না রে, মা, ওরা এদিকে আসবে না। এখন তো রোদ উঠেছে তাই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে,' হাসান উত্তর দিলো। একে একে সিংহ, ভালুক, গণ্ডার, জলহস্তী পেরিয়ে ওরা খোলা প্রান্তরে জিরাফের দল দেখতে পেলো। জিরাফের চলাফেরায় রাজকীয়ভাব আছে। ধীরে সুস্থে হাঁটছে যেন আশপাশে কেউ নেই। যখন মনে হচ্ছে গাছের মগডাল থেকে পাতা মুখে পুরে নিচ্ছে।



পাখির এলাকাটি পুরোপুরি উন্মুক্ত, জলাশয়ের পাশে নাম না জানা গাছগুলোতে ওরা বসে আছে। কিছু কিছু পাখি জলাশয়ে নেমে মাছ শিকারে মগ্ন; ম্যাকও, ফ্লেমিঙ্গো, হর্নবিল, গ্রেট হোয়াইট পেলিক্যান, আফ্রিকান ক্রাউন ক্রেইন, হেরন, মারাব্যু স্টরক, আরও অনেক জাতের সারস পাখির অবাধ বিচরণ। ফাহমিদা, অনামিকা দুজনেই মুগ্ধ আর ছবি তোলায় ব্যস্ত।

সাফারি পার্ক দেখে ওরা 'ডলফিন শো'তে এলো। দর্শক গ্যালারীর সামনে বিশাল সুইমিং পুলের মতো জলাশয়, স্বচ্ছ নীল পানিতে আনন্দ সন্তরণে এপার-ওপার করছে কয়েক জোড়া ডলফিন। জলাশয়ের ওই পারে প্রান্তজুড়ে নীল রঙের  বিল বোর্ড। বিল বোর্ডের সামনে জলের কিনারা ঘেঁষে লাল রঙের ডাইভিং স্যুট পরা তিন জন ট্রেইনার। ট্রেইনারদের ইশারায় ডলফিনগুলো কখনো একাকী আবার কখনো জোড়ায় জোড়ায় ওদের কসরত দেখিয়ে গেলো। জলের উপরে বিশ-ত্রিশ ফুট লাফিয়ে উঠে ডিগবাজী, শরীরে অবিরাম মোচড় দেওয়া, জ্বলন্ত লোহার রিং-এর ভিতরে দিয়ে পার হয়ে যাওয়া আরও কত রকম খেলা দেখাল। দর্শকদের মুহুর্মুহু করতালি, শিশুরা আনন্দে বিস্ময়ে কাঁচের দেওয়ালের কাছে চলে গেছে। শেষের দিকে তিন ট্রেইনার তিনটি ডলফিনের পিঠে চড়ে দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে 'শো'-এর সমাপ্তি টানলেন। মুগ্ধতা আর বিস্ময় নিয়ে ওরা 'ডলফিন শো' থেকে বেরিয়ে এলো।

'বাবা, ক্ষুধা লেগেছে,' অনামিকা জানালো। ওরা ভিতরেই রেস্তোরাঁতে খেয়ে 'হলিউড কাউবয় স্টান্ট শো'-এর এনক্লোজারে প্রবেশ করলো। আমেরিকার কাউবয় যুগের একটি শহরের একাংশ নির্মাণ করা হয়েছে। রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে শ্বেতাঙ্গ মার্কিনীদের দ্বন্দ্ব এই 'শো'-তে কিছুটা হাস্যরসের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে। কলাকুশলীদের অসামান্য অভিনয় দু'শ বছরের আগের চিত্র প্রায় বাস্তব রূপ দিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সবাই দেখছে, যখন শেষ হয়ে এলো, মনে খানিকটা অতৃপ্তি রয়েই গেলো।

এরপরে বার্ড পার্ক ঘুরে ঘুরে দেখলো, নানা রকমের বিভিন্ন দেশের পাখির রাজ্য। এতো রঙের প্যারাকিট পাখির সমাহার যেন সৃষ্টিকর্তা সব রঙ ওদের গায়ে ঢেলে দিয়েছেন। সব রঙ গায়ে মেখে আর সব মুগ্ধতা হৃদয়ে ধারণ করে শেষ বিকেলে হাসানরা সাফারি ওয়ার্ল্ড থেকে বেড়িয়ে হোটেলে ফিরে এলো।



## ৩৫

পরদিন ওরা সকাল হতেই বেড়িয়ে পরলো, আজ ডামনোইন সাদুয়াক ফ্লোটিং মার্কেটে যাবে, ব্যাংকক থেকে প্রায় একশ কিলোমিটার দূরে। হাসানরা ওখানে পৌঁছে সাম্পান ভাড়া করে নিলো। মার্কেটটি গড়ে উঠেছে তন খেম খালকে ঘিরে। তন খেম খালের শাখা-প্রশাখাকে কেন্দ্র করে দুই পাশে পাকা দালানে পসারীরা পসরা সাজিয়েছে। পুরোটা খাল জুড়েই সাম্পানে করে নানান ধরনের পণ্য সাজিয়ে ঐতিহ্যবাহী পোশাকে থাই রমণীরা ঘুরছে। বেশীর ভাগ পণ্যই অপ্রয়োজনীয় এবং পর্যটকদের আকর্ষণ করবার জন্য। ঘোলাটে খালের পানি আর তার উপরের হালকা তেলের আস্তরণ হাসানের অপছন্দ হলো। ফাহমিদা টুকটাক দুয়েকটা ঘরে সাজিয়ে রাখবার দৃষ্টিনন্দন থাই মুখোশ কিনলো।

ফ্লোটিং মার্কেট থেকে ওরা ব্যাংককে ফিরে এলো বিকেলে, হাসান জানালো ওদের, 'কিছুটা বিশ্রাম নাও, আজ সন্ধ্যা হতে আগামী দু'দিন তোমাদের শপিং এর সময়।' 'আহা! শপিং বুঝি শুধু মেয়েরাই করে? তোমাদের কিছু লাগে না? এই যে কাপড় পরে আছো এগুলো কি বাসায় এসে দিয়ে গেছে,' ভ্রূ কুঁচকে, ঠোঁট উল্টিয়ে ফাহমিদা ফ্রেশ হতে গেলো।

ব্যাংকক শহর জুড়েই শপিং মল, সব মানের পণ্যই মেলে। পৃথিবীর বিখ্যাত সব ব্র্যান্ড-এর পোশাক, জুতা, ব্যাগ, কসমেটিকস যেমন পাওয়া যায় তেমনি এদের অবিকল নকল সামগ্রীও মেলে। শপিং-এর প্রথম দিনে প্লাটিনাম ফ্যাশন মলে অর্ধেক বেলাতে যে কেনাকাটা হল তাতে প্রমাদ গুনল হাসান। 'ফাহমিদা, আমি এগুলো হোটেলে রেখে আসি, তোমরা এখানেই ঘুরতে থাকো, মোবাইল তো আছেই, আমি এসে জেনে নিবো কোন ফ্লোরে আছো।' হাসানের প্রস্তাবে সানন্দে রাজি মা ও মেয়ে। হাসান ফিরে এসে ওদের টার্মিনাল ২১ মলে নিয়ে গেলো। এ দোকান সে দোকান ঘুরতে ঘুরতে একটি ঘন বেগুনী রঙের টপস-এ ওর দৃষ্টি আটকে গেলো, বুকের উপরটিতে সাদা সুতোর ফুলের কাজ, তার নিচে লেখা 'live your life;' হাসান ভাবলো এই টপসটি টুনটুনিকে সুন্দর মানাবে। বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো,

নিজের ভাবনা নিজের ভিতরে রেখে দিয়ে ফাহমিদাকে অনুসরণ করলো। ওখানেই কেটে গেলো বাকিটা সময়।

শনিবার সকালে নাস্তার টেবিলে ফাহমিদা বললো, 'হাসান, আজকে আমাদের শেষ দিন এখানে। তুমি কিছু বলতে পারবে না। মুখ কালো করে থাকবে না। টাকা নিয়ে চিন্তা করবা না, আমার কিছু ডলার জমানো আছে। অনেকের জন্য গিফট কিনতে হবে।'

"ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে 'প্রত্যুনাম মার্কেট'-এ নিয়ে যাই, ওই খান থেকে হোলেসেলে তুমি কমন গিফট কিনতে পারবে," হাসান সায় দিলো।

ইংরেজিতে বলে, 'It was a riot।' বাংলায় এর যোগ্য অনুবাদ হাসান খুঁজে পেলো না। সন্ধ্যায় পরে হোটেলে ফিরে এসে হাসান ধপ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘোষণা দিলো, 'আজ আমি আর কোথাও যাবো না।' মা আর মেয়ের ক্লান্তি নেই, ফাহমিদা বললো, 'তুমি থাকো, আমি আর অনামিকা এই নিচের রাস্তা থেকে আসছি, বেশী সময় নিবো না, ওই ইন্ডিয়ান দোকানটিতে একটা ড্রেস দেখেছি, যাবো আর আসবো।' হাসানের কোনো সাড়া নেই, ফাহমিদা মৃদু নাকডাকার আওয়াজ পেলো, হাসান ঘুমিয়ে পড়েছে; সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে মা-মেয়ে বেড়িয়ে এলো।

সকালে রাজ্যের জিনিস হোটেল রুমের মেঝে, বিছানা আর টেবিলে ছড়ানো, এর মাঝে ফাহমিদা দাঁড়িয়ে হিমশিম খাচ্ছে। হাসান বললো, 'এগুলো আমাদের দুই স্যুটকেসে আঁটবে না, আমি বরং আরেকটি স্যুটকেস কিনে নিয়ে আসি, এর মধ্যে তুমি শুধু আলাদা কর কোনগুলো আমাদের আর কোনগুলো গিফট আইটেম; দুপুরে একটায় হোটেল ছেড়ে বিমানবন্দরে যাবো।'

তড়িঘড়ি করে কোন রকমে সবগুলো জিনিস প্যাক করে ওরা ঠিক একটাতেই হোটেলে থেকে চেক-আউট করে বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলো। গাড়িতে হাসানের পাশে ফাহমিদা, ওর চোখে জল, হাসান জড়িয়ে ধরে বললো, 'আমরা আবার আসবো, প্রমিজ।'



ইমিগ্রেশন পেরিয়ে ওরা বিমানে উঠবার অপেক্ষায় তখন কল এলো, ফাহমিদা জানতে চাইলো, 'কে করেছে?'

'আহমেদ ভাই, ওই যে শরীফ ভাইদের বাসায় দেখা হয়েছিল,' হাসান জানালো।

'ভাই, সালামুয়ালাইকুম, কেমন আছেন? হঠাৎ করে এই গরীবকে স্মরণ করলেন?'

'জ্বী, ভালো আছি, শুনলাম আপনার বান্ধবীর কাছ থেকে ব্যাংকক বেড়াতে গেছেন। তো ঘুরাঘুরি কেমন হচ্ছে? আপনার বান্ধবীতো আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

হাসান বুঝলো, ও ক্ষুদে বার্তা আর ফোনে সাড়া না দেওয়ায় টুনটুনি আহমেদ ভাইয়ের মাধ্যমে খোঁজ নিচ্ছে। হাসান বিষয়টি এড়িয়ে গেলো, 'ধুরও ভাই, বাদ দেন তো, আপনার কথা বলেন। আমাদের বেড়ানো শেষ, বিমানবন্দরে আছি।'

'ও তাই, ঠিক আছে, নিরাপদে ফিরে আসেন, আর নভেম্বরের দিকে আমার এখানে সপরিবারে বেড়াতে আসেন।'

'ওকে, ভালো থাকবেন, আল্লাহ্ হাফেজ,' হাসান সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফাহমিদাকে জানালো আহমেদ ভাই পঞ্চগড় বেড়ানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

৩৬

আহমেদ বাংলাবন্ধে তাঁর স্টোন ইয়ার্ড অফিসে বসে আছেন; তিনি চিন্তিত। সামনের চেয়ারে হ্যাংলা, লিকলিকে শরীর, শ্যামবর্ণ, লম্বা গড়নের এক ভদ্রলোক উপবিষ্ট; পরনে সাদা ফুল শার্ট, কালো প্যান্ট, চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, নাকের নীচে সরু গোঁফ। নাম বলেছেন, শরীফ, আর একটি সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছেন, এও বলেছেন বিষয়টি গোপনীয়।

তার অফিসটি সাদামাটা, টিনশেড, দুটো রুম, একটিতে আহমেদ বসেন আর অন্যটিতে স্টাফরা বসে। অফিসের পিছনে স্টোন ইয়ার্ড, ওখানটাতে ভারত থেকে বোল্ডার পাথর আমদানী করে রাখা হয়। মূলত নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ওজন এবং প্রকৃতির বোল্ডার পাথর চাহিদা অনুযায়ী আমদানী করেন, কিছু পাথর স্টোন ক্রাশার দিয়ে ১/২ ইঞ্চি বা ৩/৪ ইঞ্চি সাইজে ক্রাশ করে রাখেন। যখন যেভাবে চাহিদা হয় তখন সেভাবে সরবরাহ করেন।

'স্যার, একটু চায়ের কথা বলি?' আহমেদ জিজ্ঞেস করলেন।

'না, আহমেদ সাহেব, চা খাবো না, কাজের কথায় আসি, আর আমাকে স্যার বলতে হবে না।'

'জ্বী, বলেন।'

'আপনি কত বছর ধরে পাথর আমদানী করেন? এর বাইরে আপনার আর কি ব্যবসা আছে?'

'প্রায় দশ বছর ধরেই পাথর আমদানী করি। আমার অরগ্যানিক ফলফলাদির বাগান আছে, সেটি দোমনীতে।'

'ব্যবসা কেমন চলছে?'

'জ্বী, আল্লাহর রহমতে মোটামুটি ভালোই। খেয়ে-পরে আছি একরকম ভাই।'



'আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখা যায়, আপনি প্রতি বছর প্রায় ২ থেকে ৩ মিলিয়ন ডলারের পাথর আমদানী করেন। প্রতি বছরই আপনি কমবেশি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার ওভার ইনভয়েস করেন।'

এবার আহমেদের কপালে স্বেদবিন্দু ফুটে উঠলো, কানের পাশ দিয়ে জুলফি ভিজে গেছে, হঠাৎ করেই পিঠের পিছনটি ঘেমে তার পরনের শার্ট কাঠের চেয়ারে লেপ্টে গেলো। 'কি বলেন স্যার এসব, আমি একজন সৎ ব্যবসায়ী, পরিশ্রম করে খাই, আর সরকারকে দুইটা পয়সা ট্যাক্স দিতে পারলে বর্তে যাই,' আহমেদ আপত্তি তুললেন।

'আহমেদ সাহেব, সবাই সততার সাথে ব্যবসা করেন এটা আমরা বিশ্বাস করি। তারপরও আমাদের কাজ তথ্য পেলে তদন্ত করা যাতে সরকার বঞ্চিত না হয়; আপনার গত এক বছরের আমদানীর ডকুমেন্ট গুলো প্রয়োজন, আমি ওইগুলো চেক করে আপনাকে ফিরিয়ে দিবো। বিচ্যুতি না থাকলে আমার তদন্ত শেষ, বিচ্যুতি থাকলে আমার হেডঅফিসে রিপোর্ট দিবো। বাকি পদক্ষেপ হেডঅফিস নিবে।'

আহমেদ এবার একটু শক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি চাইলেই তো আমি আমার ব্যবসার নথিপত্র দিয়ে দিতে পারি না। আপনার দপ্তর থেকে আনুষ্ঠানিক নোটিশ কিংবা ওয়ারেন্ট যদি ইস্যু না হয়, আমি কি ভাবে দেই?'

'ঠিক আছে, আপনি চাইলে আমি নোটিশ পাঠাতে পারি। তাতে কি আপনার সম্মান বাড়বে? আমি গোপনেই আমার তদন্ত শেষ করতে চাই, শুধু আপনি জানলেন আর কেউ না।'

আহমেদের স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা লন্ডন থাকে, ওদের খরচ বহন করবার জন্য তাঁকে ওভার ইনভয়েস করতে হয় এটাও ঠিক। ভারত থেকে ওনার প্রিন্সিপাল হুন্ডি করে লন্ডনে ডলার পাঠিয়ে দেয়। আহমেদ বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন, এখানে ভদ্রলোকের সাথে বোঝাপড়ার সুযোগ আছে।

'স্যার, আমাকে কিছু সময় দিতে হবে, ডকুমেন্ট ফটোকপি করতে হবে।'

'আমার হাতে সময় আছে, আমি অপেক্ষা করছি, আপনার ডকুমেন্ট গুলো দেখতে আমার দিন তিনেক সময় লাগবে, এরপর আমি আবার আসবো, স্যার বলেন না আমাকে, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ।'

আহমেদ খানিক আশ্বস্ত হলেন, শরীফ সাহেব মানুষ হিসেবে মনে হয় ভালো, 'ভাই, যদি কিছু মনে না করেন, আমরা দুই ভাই দুপুরে আমার অফিসেই কয়টা ডাল-ভাত খাই, এরমধ্যে ওরা কাগজগুলো রেডি করুক।'

'না, ভাই, সেটা লাগবে না। আমি বসছি।'

এরপর আর জোরাজুরি না করে আহমেদ, শরীফের সাথে আলাপচারিতায় মগ্ন হলেন। কথায় কথায় জানলেন, শরীফ বিবাহিত, ওর স্ত্রী মেয়েসহ ঢাকায় থাকে, মেয়েটির দশ বছর হয়েছে, স্কুলে যায়, ওর স্ত্রী অভিনয় করেন। শরীফ তেরো বছর ধরে সরকারি এই দপ্তরে আছে, এখন ওর পঞ্চগড় পোস্টিং, এই শহরেই বাসা ভাড়া করে থাকেন। এরমধ্যে আহমেদের স্টাফ ডকুমেন্ট ফটোকপি করে নিয়ে এসেছে।

আহমেদ ডকুমেন্টগুলো শরীফকে দিয়ে অনুরোধ করলেন, 'ভাই, বুঝেনই তো এটা সম্মানের বিষয়। আপনি যদি অনুগ্রহ করে দোমনীতে আমার বাংলো আছে সেখানে আসেন তাহলে সেখানে আমরা আলাপ সেরে নিবো। আমার টেলিফোন নাম্বার তো আপনাকে দিয়েছি, আপনি কখন আসবেন জানালে আমি উপস্থিত থাকবো।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আপনাকে জানাবো,' বলে শরীফ আহমেদের সাথে করমর্দন করে বিদায় নিলো।



## ৩৭

শরীফ তিন দিন পরে আহমেদের সাথে যোগাযোগ করে বিকেলে দোমনীতে ওর বাংলোতে পৌঁছালো। আহমেদ সহাস্যে ওকে গেট থেকে গ্রহণ করে বাংলোর বারান্দায় বসেছে। চারদিকে সবুজের মাঝে লাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল টিনের বাংলোটি রক্ত জবার মতো ফুটে আছে। বারান্দায় কার্নিশ থেকে টবে অর্কিড ঝুলিয়েছে, সামনে তিনকোনা সবুজ ঘাসের মাঠ ঠিক তার মাঝখানে মা মেরীর প্রস্তর মূর্তি যার চারপাশে শ্বেত পাথরে বাঁধাই করা, বাংলোর প্রবেশ পথ আর বহির্গমন পথের দু'পাশে বক্সউড গুল্মের ঝোপ সুন্দর করে ছাটা। বাংলোর গাড়ী বারান্দার উপর দিয়ে কমলা আর সাদা বাগানবিলাসের ঝাড়। শরীফ বাংলোর সৌন্দর্যের প্রশংসা করলে আহমেদ বললো, 'ভাই, কাজের কথা তো হবেই, চলেন আপনাকে বাংলো আর আমার অরগ্যানিক ফলের বাগান ঘুরে দেখাই।'

আহমেদের বাংলোর ভিতরে বেশ প্রশস্ত ড্রয়িং রুম, চারটি সংযুক্ত বাথরুমসহ কক্ষ, ডাইনিং রুম যেখানে দশ-বারোজন একত্রে বসে খেতে পারে। মূল রান্নাঘরটি বাংলোর বাইরে, তবে ছোট একটি রান্নাঘর ভিতরে আছে। শরীফ বড় ড্রয়িং রুম দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলে আহমেদ জানালো যে ওর এখানে অনেকে বেড়াতে আসে, মাঝে মাঝে গানের আসর বসে। 'আসেন না ভাই, ভাবী-বাচ্চাকে নিয়ে, এখানে কয়দিন থেকে যান, ভালো লাগবে,' আহমেদ আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ করলেন।

আহমেদের বাগানে দেশি ফলের সমাহার, কি নেই সেখানে, আমলকী, আতা, করমচা, লটকন, সফেদা, কামরাঙা, জামরুল, বড়ই, কয়েক জাতের পেয়ারা, জাম, এমনকি বেশ ক'টি আম গাছও আছে। এগুলোতে কোনো কীটনাশক বা কৃত্রিম সার ব্যবহার করা হয় না জানালো আহমেদ। করতোয়া নদীর তীর ঘেঁষে ছোট চা বাগান কিনে নিয়েছেন। শেষ বিকেলের আলোয় চা বাগানটিকে মনে

হয় ঢেউ খেলানো সবুজ গালিচা, সূর্যের আলো করতোয়ার পানিতে চিকচিক করছে, নিস্তব্ধতার সৌন্দর্য আছে শরীফ উপলব্ধি করলো।

এরই মধ্যে আহমেদের বাবুর্চি বাংলোর বারান্দার টেবিলে স্ন্যাক্স সাজিয়ে দিয়েছে, চিকেন পাকোরা, সামুচা, ফিশ ফিঙ্গার, বাগানের তাজা ফল। আহমেদ, শরীফকে নিয়ে বেতের সোফায় বসলেন। 'ভাই, চলেন খেতে খেতে কথা বলি,' আমন্ত্রণ জানালেন আহমেদ।

শরীফ চিকেন পাকোরায় কামড় দিয়ে বললো, 'আহমেদ ভাই, আপনার ডকুমেন্টে কিছু সমস্যা আছে। আমাকে তো তদন্ত প্রতিবেদন দিতে হবে।' শরীফ, আহমেদকে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো বুঝিয়ে জানতে চাইলো যে ও এখন কি করতে পারে।

'আপনি আমার ভাই, আপনি সবই বোঝেন, ফ্যামিলী বিদেশে থাকে, ওদের ভরণপোষণের জন্য সহি পথে সবসময় টাকা পাঠানো যায় না, একটু আধটু এদিক-ওদিক করতে হয়। আপনি যদি আমার সম্মানের দিকে চেয়ে কিছু ছাড় দেন তাহলে রক্ষা পাই,' আহমেদ মিনতি করে।

আরও অনেক সময় আহমেদ কাকুতিমিনতি করার পর শরীফের মন কিছুটা নরম হলো, 'আচ্ছা, দেখি কি করা যায়।' এদিকে আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে, কেবল ঝি ঝি পোকার আওয়াজ ছাড়া চারদিক আরও শব্দহীন। 'শরীফ ভাই, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আজকে আপনি থেকে যান, দুই ভাই গল্প করে কাটিয়ে দেই,' আহমেদ অনুরোধ জানালেন।

'না, ভাই, আজকে থাক, কাল অফিসে কাজ আছে, আপনার এই প্রতিবেদনের সুরাহা করতে হবে, আজকে উঠি,' শরীফ বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করলো। শরীফ গাড়ীতে উঠবার সময় আহমেদ একটি মোটা খাম ওর হাতে ধরিয়ে দিলো, 'শরীফ ভাই এটা রাখেন।' শরীফের প্রবল আপত্তি টিকলো না।



'ঠিক আছে, আহমেদ ভাই, যাই, ঢাকা গেলে আমার বাসায় যাবেন বলে শরীফ গাড়ী স্টার্ট দিলো।' গাড়ী বহির্গমন ফটক দিয়ে বের হওয়া পর্যন্ত আহমেদ গাড়ী বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে রইলো। এরপর দীর্ঘ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করলো। ভিতরে যেতে যেতে ভাবলো ওকে ঢাকায় শরীফের বাসায় যেতে হবে, এই বিপদ থেকে যেভাবে হোক উদ্ধার পেতে হবে।

রিয়ানা আয়নার সামনে দাড়িয়ে সাজছে, অনিন্দিতা ঘুরে ঘুরে মাকে দেখছে, মাকে ভারী সুন্দর লাগছে। মেরুন, স্কারলেট আর পারসিমন রঙের স্ট্রাইপড কামিজ, মেরুন সালওয়ার আর একই রঙের ওড়না পরেছে; গলায় গাঢ় লাল কৃত্রিম রুবির মালা, হাতে একই রঙের ব্রেসলেট, কানে ছোট স্কারলেট টপ। রিয়ানা ঠোঁটে লিপস্টিক বুলাতে বুলাতে মেয়েকে শুধালো, 'কি রে কেমন হয়েছে?' অনিন্দিতা ওর বৃদ্ধাঙ্গুলি আর অনামিকার মাথা এক করে বুঝালো যে অসাধারণ হয়েছে।

'লক্ষ্মী মা আমার, দিদার কাছে থাকো, আমার শুটিং আছে। এই যাবো আর সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবো, ওহ্! রাতে তোমার বাবা আসবেন,' বলে রিয়ানা দরজা খুলে বেড়িয়ে গেলো। অনিন্দিতা বুঝে মা শুটিং এ যাচ্ছে না, মা এমন সাজগোজ করে যখন যায় তখন কোন এক আঙ্কেলের কাছে যায়; শুটিং-এ গেলে ওকে নিয়ে যায়। ইদানিং মা কাসেম আঙ্কেলের সাথে রাতভর কথা বলে। হয়তো তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। মা মনে করে যে অনিন্দিতা কিচ্ছু বুঝে না, ওর যে দশ ছাড়িয়ে এগারো ছুঁই ছুঁই বয়স এটা মা ভুলে গেছে। মা যখন ফিরে আসে মাকে কখনও খুব ক্লান্ত মনে হয়, কখনও বা বেশ উৎফুল্ল; মায়ের গায়ে প্রায়ই অপরিচিত গন্ধ পায়, সিগারেটের গন্ধ যখন থাকে তখন বুঝে কাশেম আঙ্কেলের সাথে দেখা করতে গিয়েছে। কাশেম আঙ্কেল এতো ধূমপান করে যে অনিন্দিতার বিরক্ত লাগে।

বাসা থেকে বেড়িয়ে রিয়ানা একটা সিএনজি নিলো, উত্তরা যাবে। সিএনজিতে বসে ভাবছে আজ কাসেমের সাথে দেখা করার কথা, শরীফ আসবে তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কাসেম শরীফেরই বন্ধু, বছর দুয়েক আগে শরীফের সাথে ওদের বাসায় এসেছিল। তারপর থেকে ও প্রায়ই আসতো, শরীফ না থাকলেও আসে; ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে বোঝাপড়া, বোঝাপড়া থেকে ভালো লাগা, এখন কোন্ পর্বে আছে এটা রিয়ানা বুঝতে পারছে না, তবে এটুকু বুঝে কাসেম ওকে ভীষণভাবে চায়, রিয়ানাও ওর সঙ্গ পছন্দ করে। ইফতির দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণের পর



দু'বছর খুব একাকী ছিল। কাসেমের সাথে যখন পরিচয় হয় তখন নাট্যাঙ্গনের একজন কো-আর্টিস্টের সাথে সম্পর্ক ছিল। সেটি বেশি দিন টিকে নি। ওর চাইতে বয়সে দশ বছরের ছোট ছিল। তারপরও বেশ কর্তৃত্বপনা ছিল। রিয়ানা এক জ্যেষ্ঠ কো-আর্টিস্টকে বলে শতাব্দী নামের ছেলেটিকে সরিয়ে দিয়েছে।

কাসেম খুব পুরুষালী, মাঝারী গড়নের, নিয়মিত শরীরচর্চা করে মাসল বানিয়েছে, শক্ত দুই হাতের মাঝে রিয়ানাকে পিষে ফেলাটা রিয়ানা উপভোগ করে। ভাবতে ভাবতে ওর গাল, নাকের ডগা লাল হয়ে উঠেছে, কান দিয়ে যেন রীতিমত ধোঁয়া বেরোচ্ছে; রিয়ানা স্বগতোক্তি করে উঠলো, 'উফ!' 'আপা, কিছু বললেন,' সিএনজি চালকের প্রশ্নে বাস্তবে ফিরে এলো রিয়ানা, 'না, ভাই, আপনি চালান।'

৭ নম্বার সেক্টরে পোঁছে লিফটের ৫-এ চাপ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অ্যাপার্টমেন্টের কেয়ারটেকার ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপা, উপরে যাইবেন? স্যার, আইছে।' রিয়ানা বুঝলো কেয়ারটেকার কি চায়। ও পার্স থেকে একশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'নেন, নাস্তা করেন।'

ফ্ল্যাটের কলিং বেল চাপ দেওয়া মাত্র খুলে গেলো, দুটি শক্ত হাত ওকে প্রায় উঠিয়ে নিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলো। রিয়ানা নিজেকে আবিষ্কার করলো বিছানার উপরে, ওর হাত দুটি মাথার উপর ধরে রেখেছে কাসেম, কাসেমের ঠোঁট ওর ঠোঁটের স্বাদ নিতে ব্যস্ত, শক্ত গোঁফের খোঁচা লাগছে উপরের ঠোঁটে, নাকে। ওর জিভে রিয়ানার জিভের সাথে পাকানো দড়ির মত প্যাঁচ খেলছে, রিয়ানা ওর মুখের ভিতর সিগারেটের স্বাদ পাচ্ছে। অস্থির কাসেম ঠোঁট থেকে থুঁতনি, থুঁতনি থেকে আরও নীচে নেমে এলো, রিয়ানাকে হ্যাচকা টানে বসিয়ে ওর কামিজ খুলে ছুড়ে ফেললো দূরে। ওর সুডৌল, সুগঠিত স্তনে কাসেমের শক্ত হাতের কঠিন পেষণে রিয়ানা আনন্দের শীর্ষে আরোহণ করে বললো, 'আর পারছি না, এবার দাও।' সুখ আহরণের এক পর্যায়ে রিয়ানার দু'হাতের নখের দাগ বসে গেছে কাসেমের পিঠে। বিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের মতো তরল লাভা ওর জঙ্ঘা বেয়ে নীচে নামছে অনুভব করছে রিয়ানা। বেশ কিছুক্ষণ ওর বুকে উপর শুয়ে থাকলো কাসেম।

কাসেম পাশ ফিরে বালিশে মাথা রেখে বেডসাইড টেবিল থেকে বেনসন এন্ড হেজেস এর প্যাকেট খুলে সিগারেট ধরালো। এখনি আপনাকে সিগারেট ধরাতে হবে, রিয়ানার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কাসেম ধূমপান করতে থাকে। দুটো লম্বা টান দিয়ে বললো, 'এই না আমাকে তুমি বললে? এখন আবার আপনি বলছো?' 'ওটা ওই সময়ে হয়ে যায়, তা ছাড়া আপনি জানেন, আমি শরীফ ছাড়া কাউকে তুমি বলি না,' রিয়ানা উত্তর দিলো।

'আজকে সন্ধ্যার পরে শরীফ আসবে।'

'আসুক, তো কি হয়েছে?'

রিয়ানা কাসেমের হাত থেকে সিগারেট কেড়ে নিয়ে নিজে একটা টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে নিভিয়ে দিলো। আমাকে সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হবে বলে কাসেমের উপর চড়ে বসে বললো, 'এবার আমার পালা।'



## ৩৯

নিকুঞ্জের ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে অনিন্দিতা বাইরে দেখছে, বিশাল গামলা আকৃতির সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে, কোন তাপ নেই, রঙ লালচে ডিমের কুসুমের মতো। সামনের লেকে সূর্যের প্রতিচ্ছবি ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে। ওর চেয়ে একটু বড় একটি ছেলে কোষা নৌকা বাইতে বাইতে উত্তর দিকে যাচ্ছে। ওর খুব ইচ্ছে হলো নৌকায় চড়বে, বাবা আসলে বলবে মনে মনে ভাবলো অনিন্দিতা। দিদার ডাকে ও দৌড়ে এলো দিদার কক্ষে, 'কি হয়েছে দিদা? দরজা খোল, কলিং বেল বাজে, তোর মা এসেছে মনে হয়,' দিদা বললেন।

দরজা খুলে দিতে রিয়ানা ঢুকেই মেয়েকে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কলিং বাজে, শুনতে পাও না? ময়না কোথায়? ও শুনে না?' মায়ের অগ্নিমূর্তি দেখে থমকে গেলো অনিন্দিতা, মায়ের গা থেকে সেই অপরিচিত গন্ধ পাচ্ছে, সাথে সিগারেটের গন্ধও। আমি ফ্রেশ হই, ময়নাকে চা বানাতে বল, বলে রিয়ানা নিজের কক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। অনিন্দিতা জানে মা এখন অনেক সময় নিবে, এক ঘণ্টা তো লাগবেই।

শরীফ দশটায় বাসায় পৌঁছালো, দরজা খুলে দিয়ে একলাফে বাবার গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ল অনিন্দিতা, 'বাবা, তোমার এতো দেরী কেন?' মেয়েকে একহাতে ধরে রেখে হাতের ব্যাগ ময়নার দিকে বাড়িয়ে নিজের কক্ষে রাখতে বললো শরীফ। রিয়ানার কক্ষের দরজা ভেজানো, ও ফোনে কথা বলছে, শুধু শুনতে পেলো, 'রাখি শরীফ এসেছে।'

'আনা, আমি এসেছি, কল্যাণপুরে জ্যামে অনেকক্ষণ আটকে ছিলাম,' শরীফ জানালে রিয়ানা বললো, 'ঠিক আছে তুমি চেঞ্জ করে আসো, টেবিলে খাবার দিতে বলি।' শরীফ মাকে পা ছুঁয়ে সালাম করে মায়ের কুশল জিজ্ঞেস করলো। 'শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, প্রেসার বাড়ছে,' মা জানালেন। 'আচ্ছা, মা, কাল বিকালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো,' বলে শরীফ আলমারি থেকে লুঙ্গি আর তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলো।

ডিনার টেবিলে বসে সবাই গল্প করছে। অনিন্দিতা বাবা এলেই একটু কথা বলে, ওর সব কথা বাবার সাথে; পুরো সপ্তাহে কি হলো, ওর ক্লাস কেমন হচ্ছে, ক্লাস টিচার কি বলেছে। শরীফ মনোযোগ দিয়ে মেয়ের কথা শুনে। রিয়ানা মেয়েকে মৃদু ভর্ৎসনা করে, 'আহা! বাবাকে কথা বলতে দাও।'

শরীফ এলে রিয়ানা ভাল-মন্দ রান্না করায়, টেবিলে শরীফের প্রিয় খিচুড়ী, গোল বেগুন ভাঁজা, পটল ভাঁজা, গরুর মাংসের ভুনা, দেশী মুরগীর কারি আর দই সাজিয়ে দিয়েছে। শরীফ খুব অল্প খায় কিন্তু টেবিলে ভরে খাবার থাকা পছন্দ করে। শরীফ খেতে খেতে ওর পঞ্চগড়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছে, আহমেদ সাহেবের বাংলোর কথা বললো, ভীষণ সুন্দর জায়গাটি জানালো।

'তাই, তাহলে তো আমরা বেড়াতে যেতে পারি।'

'হ্যাঁ, যাবো। আহমেদ সাহেব কাল সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় আসবেন।'

'তাহলে তো ভালোই হয়, হঠাৎ করে অপরিচিত কারো কাছে গিয়ে উঠতে হবে না,' রিয়ানা বললো। 'আচ্ছা, ভদ্রলোক কি খেতে পছন্দ করেন,' রিয়ানা যোগ করলো।

'দেখো, তুমি যা ভালো মনে করবে দিবে, প্রথমবার তো, জানা হয়ে যাবে।'



## ৪০

শুক্রবার রাত আটটায় আহমেদ, শরীফের বাসায় কলিং বেল চাপ দিয়েছে, ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে দরজা খুলে বললো, 'আসসালামু আলাইকুম, আঙ্কেল।' 'তুমি অনিন্দিতা, আমি তোমার আহমেদ আঙ্কেল, বাবা আছেন,' আহমেদ জানতে চাইলে অনিন্দিতা সায় দিয়ে আহমেদকে ড্রয়িং রুমে বসালো। আহমেদের হাতে অনেকগুলো গিফট প্যাক, এর থেকে চকলেটের বড় বাক্সটি আহমেদ অনিন্দিতার হাতে দিয়ে বললেন, 'মা, এটা তোমার।' অনিন্দিতা খুব সম্ভ্রম আর লজ্জায় চকোলেটের বাক্সটি নিয়ে দৌড়ে ভিতরে বাবার কাছে গেছে।

শরীফ ড্রয়িং রুমে এসে আহমেদকে দেখে বললো, 'ভাই, সরি, ভিতরে ছিলাম, আপনি কেমন আছেন? অনি, মাকে বলো আঙ্কেল এসেছেন।'

'শরীফ ভাই, ব্যস্ত হয়েন না, আমি ভালো আছি।'

'আহমেদ ভাই, ওগুলো কি নিয়ে এসেছেন? এটা তো ঠিক করেন নাই!'

'ভাইয়ের বাসায় আসছি প্রথমবার, খালি হাতে কিভাবে আসি?'

এরপর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপচারিতা শুরু হলো, সমসাময়িক রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য। আলোচনার মাঝে ময়না একটি ট্রে তে কাজু বাদাম, গ্লাস ভর্তি কমলার রস দিয়ে গেছে। বেশ কিছু সময় গল্প করার পর রিয়ানা এলো। শরীফ পরিচয় করিয়ে দিলো, 'আহমেদ ভাই, যার কথা তোমাকে বলেছি, আহমেদ ভাই এই আমার গিন্নী আনা।' আহমেদ উঠে দাড়িয়ে সম্মান দেখালেন, 'ভাবী বসেন, আপনাকে ছাড়াই আমরা আড্ডায় মশগুল হয়ে গেছি।'

রিয়ানা কুশলাদি জিজ্ঞেস করে বললো, 'আপনারা গল্প করেন, আমি টেবিল সাজিয়ে আসি।'

'ভাবী, এতো তাড়া কিসের! কিছুক্ষণ বসেন, গল্প করি।'

রিয়ানা ভদ্রলোককে ভালো করে দেখলো, পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়স, মাঝারি সোজা চুল বামে সিঁথি করে আচড়ানো, ক্লিন শেভড, হালকা নীল রঙের ফুল শার্ট পরেছেন যার কলার ও কাফ সাদা, ছাই রঙের প্যান্ট, কালো বেল্ট, কালো অক্সফোর্ড জুতো, সবমিলিয়ে মার্জিত রুচির ছাপ। গল্পে গল্পে সময় অনেকখানি চলে গেছে। রিয়ানা উঠে খাবার সাজিয়ে আবার ফিরে এসেছে। আহমেদ গল্পের ফাঁকে রিয়ানাকে দেখে নিয়েছে; পদ্মলোচনা, থুঁতনির ভাঁজ, ঝাঁকড়া কালো চুলে ওর দৃষ্টি আটকে গেলো। আজকে রিয়ানা শাড়ি পড়েছে, সোনালী পাড়ের গাড় নীল কাতান, আঁচল আর ব্লাউজ সেরুলিয় নীল রঙের, মিল রেখে নীল পাথরের সেট গলায়, কানে নীল পাথরের ঝুমকা, নীল টিপ আর গোলাপি লিপস্টিকে দমবন্ধ করা সুন্দর লাগছে।

খেতে গিয়ে একসময় আহমেদ বলেই ফেললেন, 'শরীফ ভাই, আপনি ভীষণ ভাগ্যবান পুরুষ। ভাবী যেমন সুন্দর তেমন অসাধারণ রান্না করেন।' শরীফ উত্তর দিলো, 'ভাই কি যে বলেন।'

রিয়ানা আহমেদের চোখের ভাষা পড়ে ফেলেছে। 'আপনাকে ধন্যবাদ ভাই, আমি আহামরি কিছু নই, আর রান্না ভালো হওয়ার কৃতিত্ব আমার শাশুড়ি মায়ের,' রিয়ানা বিনয়ের সাথে বললো। 'আপনার মা সাথে আছেন, তা হলে তো আপনি সবচেয়ে বেশী ভাগ্যবান, শরীফ ভাই,' আহমেদ জোর দিয়েই বললেন।

খাওয়ার পর ওরা আবার ড্রয়িং রুমে বসেছে। এবার আলাপচারিতা রিয়ানা আর আহমেদের সাথেই চলছে বেশি, শরীফ মাঝে মাঝে সঙ্গ দিচ্ছে। রিয়ানার সিনেমা আর নাটকে অভিনয়ের প্রসঙ্গে আহমেদের তুমুল উৎসাহ, ওর বাংলোতে শুটিং আর বেড়ানোর আমন্ত্রণ জানাতে ভুললো না। কথায় কথায় রিয়ানা বললো, 'ভাই আপনি আমাদের আপনি না বলে তুমি বলেন, আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব।' শরীফেরও তাতে জোর সায় দেখে আহমেদ সম্মতি দিলেন।



আড্ডায় আড্ডায় রাত গড়িয়ে গেছে অনেকখানি। শরীফের হাই উঠা দেখে আহমেদ বিনীতভাবে বিদায় চাইলো। ওরা ওকে গাড়ি পর্যন্ত এসে বিদায় দিলো। লেটেস্ট ২০০৩ মডেলের রুপালী রঙের প্রাডো দেখে, রিয়ানা বললো, 'আপনার গাড়িটা তো জোস!'

'তোমার পছন্দ হয়েছে? ঢাকায় যখন আসবো, ওই সময় গাড়ী তোমার,' আহমেদ গাড়িতে বসে উত্তর দিলেন।

'ধ্যাৎ, ভাই, আমি কি তাই বলেছি? ভালো থাকবেন, আবার আসবেন আমরা খুশী হবো,' রিয়ানা বিদায় জানালো।

আহমেদকে বিদায় দিয়ে ওরা উপরে উঠে যে যার কক্ষে চলে গেছে। অনিন্দিতা ঘুমিয়ে গেছে, রিয়ানা অনেক সময় নিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখলো, জিজ্ঞেস করলো আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বকে, 'তুমি কার?'

## ৪১

হাসান ওর অফিসের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গলফ মাঠের প্রিয় সবুজ প্রান্তরের দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে, জ্যেষ্ঠ মাসের গরমে হাফিয়ে উঠছে প্রকৃতি; ছোট্ট একটি ধুলোর ঘূর্ণি ফেয়ারওয়েতে ঘুরপাক খেয়ে পূর্ব-পশ্চিম আলম্বিত স্যান্ড বাঙ্কারে আশ্রয় নিয়ে আরও কিছু ধুলো সংযোজন করে মেহগনি গাছের মগডাল পর্যন্ত উঠে নেতিয়ে পড়েছে। ব্যাংকক থেকে ফিরে আসার পর প্রায় ছয় মাস হয়ে গিয়েছে, এরমধ্যে অনেকবার টুনটুনি ক্ষুদেবার্তা পাঠিয়েছে যার বেশীর ভাগই হাসান না পড়েই মুছে দিয়েছে; ওর টেলিফোনে কলগুলো বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে থেমে গেছে। শীতের যমুনা নদীর মতো হাসানের নিস্তরঙ্গ জীবনে ওই ধূলোর ঘূর্ণির মত এসে টুনটুনির অধ্যায়টি ধুলোর ঘূর্ণির মতই নেতিয়ে পড়েছে, কখনো মনে পড়ে কখনো-বা সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও মনে পড়ে না। অনেকদিন বসবাস না করা ঘরে আসবাবপত্রের উপর যেমন ধুলোর আস্তরণ পড়ে ওর মনের উপর তেমনই আস্তরণ পড়েছে।

তবে কাল টুনটুনির পাঠানো ক্ষুদেবার্তাটি নিয়ে ও ভাবছে, 'বিপদে আছি, আপনার সাহায্য কামনা করি, কথা বলতে চাই, অনুগ্রহ করে সাড়া দিবেন, টুনটুনি।' ধুলোর আস্তরণ সরিয়ে ক্ষুদেবার্তায় সাড়া দিলো, 'কি করতে পারি?'

'কথা বলতে চাই, ঝামেলায় আছি।'

'ঠিক আছে, কল করছি।'

'না, সামনাসামনি কথা বলতে পারলে ভালো হয়।'

'বিকেলে অফিসে আসেন, সময় বের করে রাখবো।'

'অফিসে বা রেস্তোরাঁয় বসে বলতে পারবো না, ব্যক্তিগত বিষয়। আপনি দয়া করে যদি আপনার বন্ধুর বাসায় আসেন সেখানে কথা বলা আমার জন্য সহজ হবে।'

'ঠিক আছে, আমি মাহমুদের সাথে যোগাযোগ করে আপনাকে জানাচ্ছি।'



মাহমুদকে ফোন করতেই সোৎসাহে সম্মতি দিলো, 'বন্ধু, চলে আয়, আমার বাসা তোরই বাসা, আমি বিকেলের ফ্লাইটে চলে যাবো, তবে কেয়ারটেকার থাকবে।' হাসান টুনটুনিকে জানিয়ে দিলো যে বিকাল পাঁচটায় মাহমুদের বাসায় দেখা হবে, তবে পাঁচটা মানে পাঁচটাই। টুনটুনির সময়জ্ঞান সম্পর্কে হাসানের ভালো ধারণা আছে।

## ৪২

বিকালে পাঁচটার কিছু আগেই হাসান, মাহমুদের বাসায় এসে কেয়ারটেকারকে স্ন্যাক্স আনার জন্য পাঠিয়েছে। টুনটুনির কল এলো, 'আমি কাছাকাছি, আসবো?' মাহমুদ হাসান ও টুনটুনিকে গেট থেকে সম্ভাষণ জানিয়ে উপরে নিয়ে গেলো।

দোতলায় কক্ষে প্রবেশ করে টুনটুনি হাসানকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরতে গেলে হাসান মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, 'না, থাক।' কিছুটা সময় ওকে বুকে আঁকড়ে রেখে মাথায় মমতায় হাত বুলিয়ে সোফায় বসালো।

'কেমন আছেন আপনি? কি হলো হঠাৎ?'

'আপনি আমার উপর রেগে আছেন। আমার কোনো কল ধরেন না, মেসেজের উত্তর দেন না। জানি না সেদিন আপনি কি দেখেছেন! আহমেদ ভাই আমাদের পুরোনো পারিবারিক বন্ধু।'

হাসান হাত তুলে টুনটুনিকে থামালো, 'আপনি কি এজন্য আমাকে ডেকেছেন? তাহলে আমাদের আর কোনো কথা নেই।' টুনটুনি স্তব্ধ হয়ে অনেকটা সময় নিচের দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন একযুগ পরে মুখ তুলে হাসানের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি ভীষণ বিপদে আছি'। ওর চোখে জল, মুখটি শুকিয়ে আছে, চোখের নীচে কালো দাগ পড়েছে। হাসানের মায়া হলো, ও টুনটুনির হাত ধরে বললো, 'আমি আছি, বলেন।'

টুনটুনির কথা:

আমি আপনাকে রুবেলের কথা বলিনি। ইফতি চলে যাওয়ার পর আমি মানসিকভাবে ভীষণ ভেঙে পড়ি। এক বছর কোথাও বের হই নি, এরপরে ধীরে ধীরে আবার আমার বান্ধবীর অনুপ্রেরণায় থিয়েটারে যাওয়া শুরু করলাম, নাটকের ডিরেক্টরদের সাথে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করলাম। আমার জীবন নতুন করে শুরু হলো। নাটকে ডাক পেতে শুরু করেছি। যদিও কোনো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পাই নি। তবুও ফিকে হয়ে



আসা জীবনে আলোর ছোঁয়া, রঙের প্রলেপ পড়ছে। এক বছরে বেশ মুটিয়ে গিয়েছিলাম, বাসার কাছেই জিমে ভর্তি হয়ে তিন চার মাসের মধ্যে বাড়তি মেদ ঝরিয়ে শরীর আগের মত টানটান হয়েছে। নাটকের পুরুষ সহশিল্পীদের সপ্রশংস দৃষ্টিতে বুঝতে পারি আমি নিজেকে আবারো মেলে ধরছি।

নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে রুবেলের সাথে পরিচয়। আমার চেয়ে বছর দশেকের ছোট, আপু বলে ডাকতো। অভিনয়ের সময়ের বাইরেও আমরা সময় কাটাতে শুরু করেছি। আমার বড় মেয়েটি তখন সাত-আট বছরের হবে। অত্যন্ত চঞ্চল, প্রাণবন্ত ছিল রুবেল, ও নিমেষেই আমার মেয়েকে আপন করে নিলো। ও উত্তরায় থাকতো বাবা-মায়ের সাথে, আমি ওদের বাসায় গিয়েছি, ওর বাবা-মাও আমাকে খুব আপন করে নিলেন। শুটিং-এর বাইরে আগে বা পরে আমরা ক্যাফেতে বসে আড্ডা দিতাম, কখনও একসাথে ডিনার করতাম। শুটিং-এ দেরী হয়ে গেলে আমার গাড়ী দিয়ে ওর বাসায় পৌঁছে দিতাম। এক সময় আমাদের মেলবন্ধনটি প্রগাঢ় হলো। আমি বুঝতে পারলাম ওর জন্য আমার ভালোলাগার বোধ জন্ম নিয়েছে। ওর দুষ্টুমিতে মাঝে মাঝে নিখাদ বন্ধুত্বের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ছে। ক্যাফেতে বসে আছি ও হয়তো সবার সামনেই আমার হাত ধরে থাকলো, প্রথমদিকে অস্বস্তিতে হাত ছাড়িয়ে নিতাম, পরে আর ইচ্ছা করতো না; ভাবতাম থাকুক-ই না হাত ধরে, এতে আর দোষের কি!

একদিন শুটিং থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়েছে। ওর বাবা-মা এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ওকে আমাদের বাসায় থেকে যেতে বললাম। ও একটু ইতস্তত করে রাজী হলো। কলিং বেল বাজাতে ময়না দরজা খুলে দিয়েছে, ওর কাছে জানলাম শ্বাশুড়িমা ঘুমিয়ে গেছেন, অনিন্দিতা ওনার সাথেই ঘুমিয়েছে। আমি ওকে আমার ঘরেই মেঝেতে বিছানা করে দিয়েছি। সেই রাতটি আমার নির্ঘুম কেটেছে। সকালে উঠে ওকে নাস্তা করিয়ে বিদায় দিয়েছি আমার শাশুড়ীমা উঠার আগেই।

এরপর থেকে ও মাঝে মাঝেই থেকে যেত, নিজে থেকেই। আমার মেয়েও অভ্যস্ত হয়ে গেছে মামাকে পেয়ে। সেদিন আমাদের সাথে শুটিং-

এ অনিন্দিতাকে নিয়ে গিয়েছি, ফেরার সময় গাড়ির চাকা ফুটো হয়ে যাওয়াতে মাঝপথ থেকে আমরা সিএনজি করে বাসায় এসেছি; এরই মধ্যে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে, সিএনজির পলিথিন বৃষ্টির দাপট আটকে রাখতে পারেনি, আমরা সবাই কাকভেজা হয়ে ঘরে ঢুকেছি। ওকে আর বৃষ্টির মধ্যে যেতে না দিয়ে শরীফের লুঙ্গি আর গোল গলা টিশার্ট বের করে দিয়েছি। ও ফ্রেশ হয়ে ড্রয়িং রুমে বসে টিভি দেখছে, এদিকে আমরাও ভেজা কাপড় ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি, মেয়েকে ঘুম পারিয়ে ওর কাছে এলাম। দুজনে অনেকক্ষণ টিভি দেখতে দেখতে গল্প করলাম। মাঝ রাতের পরে ওকে বললাম, 'ঘুমাবে না,' ও ড্রয়িং রুমেই ঘুমাতে চাইলে আমি দিলাম না। আমার রুমেই সেদিনের মতো বিছানা করে দিয়েছি। আমি মেয়ের কাছে শুতে যাচ্ছি, ও আমার হাত টেনে ধরলো, 'আপু এখানে থেকে যাও।' আমার কি হলো জানি না, আমি ওর পাশে শুয়ে পড়েছি, আমাদের বাঁধ ভেঙে গেলো, বাইরে তখনও অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে।

ওই যে বাঁধ ভাঙলো, বন্যার জল হুহু করে ঢুকে পড়েছে আমার মনে আমার শরীরে। আমরা কেবলই সুযোগ খুঁজেছি কিভাবে একসাথে থাকা যায়। ওর বাবা-মা দেশের বাড়ীতে গেলেন দিন-পনেরো থাকবেন, ওই পনেরো দিন সারাদিনই ওর বাসায় কাটিয়েছি, আমার মেয়ের দিকেও নজর দেই নি। ওই সময়ে আমার সর্বনাশটি হয়েছে, ও দুষ্টুমি করে আমাদের অন্তরঙ্গ ছবি তুলতো। প্রথমদিকে আমি জোর করে মোবাইল কেড়ে নিয়ে ছবি মুছে দিয়েছি, সব কি মুছতে পেরেছি।



## ৪৩

এক বছরের বেশী সময় ধরে আমাদের অন্তরঙ্গতা ছিল, আশপাশে যখন কানাঘুষা হতে শুরু করলো তখন আমি ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। গত চার বছর ওর সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই, মাঝে মধ্যে 'হাই-হ্যালো' বলা ছাড়া। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাকে ফোন করছে, আমার সাথে দেখা করতে চায়, আমাকে মিস করে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি পাত্তা না দেওয়াতে একদিন ফোন করে আমাকে জানালো যে ওর কাছে এমন কিছু আছে যা অন্যেরা জানলে আমার জন্য ভালো হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি ও কি বুঝাতে চাইছে।

অনেকসময় ধরে কথা বলে রিয়ানা হাঁপিয়ে উঠেছে, হাসান নিবিষ্টমনে ওর কথা শুনছিল।

'আপনি বাথরুমে গিয়ে মুখটি ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আসেন, আমরা খেতে খেতে বাকীটুকু শুনবো,' হাসান একরকম জোর করেই ওকে পাঠালো।

রিয়ানা ফিরে এলে হাসান বললো, 'আমি সমস্যাটি বুঝতে পেরেছি। আপনি কি চান? ওকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিবো আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করবার জন্য?'

'না, সেটা হলে জানাজানি হবে, আমি আরও অসম্মানিত হবো। শুধু ওর মোবাইল থেকে আমার ছবিগুলো মুছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে আমি উপকৃত হই।'

'ঠিক আছে, এখন খেয়ে নিন, আমি কাল আমার বন্ধু আছে র‍্যাবে, ওর সাথে কথা বলে জানাবো কি করতে হবে।'

'এখন চলুন আমরা উঠি', হাসান উঠতে গেলে রিয়ানা ওর হাত জড়িয়ে ধরে কাছে টানলো, 'আমাকে একটু আদর করবেন না!'

'রিয়ানা, আপনি বিপদে পরে আমার কাছে এসেছেন। আমি আমাদের সম্পর্কটিকে বন্ধুত্বের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেই, এই সময়ের সুযোগ নিয়ে ওই সম্পর্কটির অবমাননা করতে চাই না, চলুন আপনাকে নামিয়ে দেই।'

## ৪৪

হাসান পরদিন অফিসে এসেই ওর বন্ধুকে ফোন করে জেনে নিয়েছে আছে কিনা, তারপর উত্তরায় র‍্যাব অফিসে ওর কাছে গিয়েছে। গেটে ওর নাম দেওয়া আছে, কালো ইউনিফর্মধারী আর্দালি বেশ সম্মানের সাথে ওকে অধিনায়কের কক্ষে নিয়ে গেলো।

চেয়ার থেকে উঠে এসে ওর ছোট বেলার স্কুলের বন্ধু লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাহাদাত ওকে জড়িয়ে ধরে, 'কতদিন পর তোর সাথে দেখা বল তো? সমস্যা না থাকলে তো আসতি না, বল তো কি হয়েছে? আগে তোর কথা শুনি, পরে গল্প করব।'

হাসান ওকে রিয়ানার সমস্যাটি খুলে বললো, এও জানালো শরীফ ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুর সংসারে বিপদ নেমে আসুক এটি ও চায় না।

'এটি কোন ব্যাপার না, তুই ভাবীকে বল্ আমার বরাবর একটা অভিযোগ লিখে এনে কাল দুপুরে যেন দিয়ে যায়। উনি সরাসরি আসতে পারেন, না চাইলে তুই সাথে আসিস।'

হাসান বন্ধুর সাথে আরো কিছুটা সময় কাটিয়ে অফিসে ফিরে এলো। টুনটুনিকে ফোন করে জানালো কি করতে হবে। টুনটুনি ইতস্তত করছিল, 'লিখিত অভিযোগ দিতে হবে?'

'দেখুন, ওরা একটি ছেলেকে ধরবে বা জিজ্ঞাসাবাদ করবে, ওদের তো একটা আইনী অবলম্বন থাকতে হবে, কিসের ভিত্তিতে কাজটি করছে? আপনি ভেবে দেখেন।'

'আপনি আমার সাথে যাবেন?'

'প্রয়োজন হলে যাবো।'

পরদিন দুপুরে লাঞ্চের পর ওরা দুজনে অধিনায়কের অফিসে গেলো। টুনটুনি অভিযোগ লিখে আনেনি, শাহাদাত বুঝিয়ে দিলো কিভাবে লিখতে হবে, আর জানালো যে সাতদিন সময় দিতে হবে, তদন্ত করে ছেলেটিকে ওর অফিসে নিয়ে আসবে, সেদিন ভাবীকেও



আসতে হবে। র‍্যাব অফিসের কাজ শেষে হাসান রিয়ানাকে বিদায় দিয়ে নিজের অফিসে ফিরে এলো। রিয়ানা কোথাও বসতে চাইছিল, হাসান জানালো যে ওর অফিসে কাজ আছে।

সাতদিন সময় নেয় নি শাহাদাত, পাঁচদিনের মাথায় ওদের ডাক পড়লো। শাহাদাতের অফিসে ওর সামনের চেয়ারে রিয়ানা বসেছে, শাহাদাতেরই পরামর্শে হাসান পিছনে সোফায় বসেছে। সেই আর্দালি একটি ছেলেকে নিয়ে অফিসে ঢুকলো, শাহাদাত তাঁকে রিয়ানার পাশের চেয়ারে বসার নির্দেশ দিলো।

'ভাবী, দেখেন তো ওনাকে চিনেন কিনা?'

'জ্বী, এই রুবেল।'

'ঠিক আছে, আমরা ওনার মোবাইল, ল্যাপটপ সীজ করে আমাদের আইটি এক্সপার্ট দিয়ে ক্লিন করে দিয়েছি, উনি আপনাকে আর ভয় দেখাতে পারবেন না। ওনার কাছ থেকে মুচলেকা নিয়েছি। আপনি চাইলে ওনার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে ওকে আমরা থানায় হস্তান্তর করবো।'

'আমি বিষয়টি থানা-আদালত পর্যন্ত গড়াক সেটি চাই নি, ভুল আমারও হয়েছে, মানুষ চিনতে ভুল করেছিলাম।'

শাহাদাতের নির্দেশে রুবেলে করজোড়ে রিয়ানার কাছে ক্ষমা চাইলো, আর জানালো যে কখনই রিয়ানাকে যে কোনভাবেই হোক বিরক্ত করবে না। হাসান রিয়ানার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো কালো মেঘটি সরে গেছে, ওকে বেশ নির্ভার মনে হচ্ছে।

শাহাদাত আর্দালিকে রুবেলকে নিয়ে যেতে বললো। 'ভাবী, ব্যাপারটি এখানেই শেষ, আশা করি আপনি এমন ভুল আর করবেন না। আমার বন্ধুর খাতিরে আমি নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজটি করেছি, সাধারণত এই ধরনের অভিযোগ তদন্ত করে আমরা পুলিশে হস্তান্তর করি যাতে সুষ্ঠু বিচার হয়। যাহোক, আমি উঠবো, আমার মিটিং আছে,' শাহাদাতের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ওরা ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেড়িয়ে এলো।

রিয়ানা হাসানকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি ব্যস্ত? আমরা কোথাও বসতে পারি, আপনার বন্ধুর ওখানে?'

হাসান মৃদু হেসে বললো, 'চলেন, আমরা আরকে টাওয়ারে পিজাহাটে বসি।'

'আছি।
বড্ড জানান দিতে ইচ্ছে করে, —আছি,
মনে ও মগজে
গুন গুন করে
প্রণয়ের মৌমাছি।' —হেলাল হাফিজ



## ৪৫

'হাই, কেমন আছেন?'

'ভালো, ধন্যবাদ, আপনি?'

'এই তো! কাল কি করছেন? সন্ধ্যায় কি ফ্রি থাকবেন?'

'কেন?'

'আমার ছবি রিলিজ হয়েছে, 'শূন্য কোণ'। আপনি চাইলে আমরা একসাথে বলাকা সিনেমা হলে দেখতে পারি।'

'ভালো লাগলো শুনে, অভিনন্দন। আপনার ছবি যখন ফ্রি তো হতেই হবে। তাহলে এক কাজ করেন, আপনি বিকেলে এখানে চলে আসেন। আমরা একসাথেই যাই। সিনেমা শেষে আপনাকে নামিয়ে দিবো।'

'ওকে, বাই।'

হাসান সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সামনে রাখা এনবিআর-এর উদ্দেশে লেখা ড্রাফটটিতে মনোনিবেশ করলো; সরকারি প্রোজেক্টের জন্য আমদানিকৃত মেশিনারিজের ক্ষেত্রে ছাড় পাওয়া প্রয়োজন, সরকারি দপ্তর থেকে নোটিফিকেশন অ্যাওয়ার্ড এই ছাড় পেতে সহায়তা করবে। ওর মনোযোগ বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলো না, ওই ফোন কলটির কথা মনে পড়লো। র‍্যাব-এর সহায়তা নিয়ে সেই ভয়ঙ্কর বিব্রত হওয়া থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর টুনটুনি ওকে প্রায়ই ফোন করে। এটা সেটা অনেক কথা হয়, ভাইবারে চ্যাটিং হয় বেশী। হাসান টুনটুনির সঙ্গ উপভোগ করে; উচ্ছলতা আর প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, মনেই হয় না চল্লিশ পেরিয়েছে কিংবা ছয় আর ষোল বছরের দুই কন্যার মা। মন ও শরীর দুটোকেই ধরে রেখেছে তিরিশ ছুঁই ছুঁই, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ষোল আনাই নিজের মত করে পেতে চায়।

সিনেমা হলের দোতলায় সবচেয়ে পিছনের সারিতেই আসন গ্রহণ করেছে ওরা, ওদের সামনের সারিটি প্রায় খালি; তারপরে আবার দুই-তিন সারি মোটামুটি ভরে আছে। 'আপনাকে দারুণ লাগছে, ব্ল্যাক শার্টে আপনাকে ভীষণ মানায়!' কানের কাছে রিয়ানা ফিসফিস করে বললো। ওর তপ্ত নিঃশ্বাস কানের লতি ছুঁয়ে ঘাড় অবধি পৌঁছেছে, হাসান ঘাড় ফেরাতে রিয়ানার ঠোঁট ওর গাল ছুঁয়ে গেলো। হাসান অন্ধকারে রিয়ানাকে দেখবার চেষ্টা করছে, ও বললো, 'আপনাকেও ভীষণ সুন্দর লাগছে!'

'তাই, আপনার কাছ থেকে এটুকু শোনার অপেক্ষায় ছিলাম।' টুনটুনির অভিমানী কণ্ঠ হাসান বুঝতে পেরে ওর হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বুকের কাছে ধরে বললো, 'যার বসবাস এর ভিতরে তাঁকে কি বলবো, তাঁকে যে ভিতরের ঐ যন্ত্রটি অবিরাম প্রশংসা করে যাচ্ছে।'

টুনটুনি হাসানের কাঁধে মাথা নামিয়ে পর্দার দিকে তাকিয়ে রইলো, নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়েছে; মেয়েটি একটু প্রশংসায় কেমন আপ্লুত হয়ে যায়, হাসান ভাবলো আর ওর বাঁ হাতের তর্জনী রিয়ানার ঠোঁটে ছুঁয়ে নিজের ঠোঁটে চেপে ধরে বললো, 'ছবি দেখি?'

'হুম।'

প্রায় তিন ঘন্টা ছবি দেখে হল থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা, হলের বাইরে ফুটপাতে ভুট্টার ফেরিওয়ালা দেখে রিয়ানার আবদার, 'চলেন, ভুট্টা খাই!' ওর তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাস আর প্রগলভতায় সাড়া দিয়ে হাসান ফেরিওয়ালার থেকে দুটো পোড়ানো ভুট্টা কিনেছে।

'কেমন দেখলেন ছবি?' সতর্ক হয়ে দাঁতের ফাঁকে ভুট্টা চেপে ধরে জানতে চাইলো রিয়ানা, নিয়নের আলোয় চিকচিক করছে ওর সামনের দুটো দাঁত, খরগোশের কথা মনে হওয়ায় হেসে ফেললো হাসান।

'হাসলেন কেন?'



এমনিতেই, সাবধানে, ঠোঁট পুড়ে যাবে, হাসানের সতর্কবাণী; মোহনীয় ভঙ্গীতে ঠোঁট উল্টে রিয়ানা বললো, 'কিচ্ছু হবে না, আপনি নেন না একটু আমার এখান থেকে।' রিয়ানার বাড়িয়ে ধরা ভুট্টায় ছোট কামড় দিয়ে কয়েকটি দানা খসিয়ে নিজের মুখে পুরে নিয়েছে হাসান। ছবিটির আলোচনা করে রিয়ানার এই আনন্দমুখর মুহূর্তটিকে ম্লান করতে ওর মন চাইছে না।

ছবিটির গল্প প্রেম ও প্রতিহিংসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে; সুমিতকে ওর বিবাহিতা স্ত্রী ছেড়ে অন্য আরেকজনের হাত ধরে চলে যায়, ইতোমধ্যে একটি দুর্ঘটনায় ওদের একমাত্র পুত্র সন্তানের মৃত্যু হয়। পরপর দুটো ঘটনায় মানসিক আঘাতে সুমিত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং ওর স্থান হয় মানসিক হাসপাতালে। মুন প্রভাবশালী গ্রামপ্রধানের একমাত্র মেয়ে। পিতার অপরাধের কারণে বাড়ী থেকে পালিয়ে মানব পাচারকারির খপ্পরে পড়ে। যে তাঁকে অন্যত্র বিক্রি করে দেয়। একাধিকবার ধর্ষণ ও অত্যাচারের শিকার মুনও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালে ওদের দুজনের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠে। ওরা নিজেদের প্রতি অবিচারের ও অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। একের পর এক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিহিংসার প্রতিফলন ঘটায়। ছবিটির ক্লাইম্যাক্স এই দু'জনের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। পুরো ছবিতে রিয়ানাকে খুব ছোট একটি ভূমিকায় দেখা যায়। যেখানে যৌনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো ছাড়া আর কোনো অভিনয়ের সুযোগ ছিলো না। এই যৎসামান্য এবং ভীষণ আপত্তিকর চরিত্রে রিয়ানার অভিনয় করাটা হাসানের কাছে বিস্ময়কর। নিজেকে অভিনয়ের সাথে যুক্ত করবার জন্য এই চরিত্রে অভিনয় কোনোভাবেই সম্মানজনক তো নয় বটেই রিয়ানার মেয়েদের কাছে বা শরীফের কাছেও এটি কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা হাসানের কাছে বোধগম্য হলো না।

ভুট্টার স্বাদ নিতে নিতে হাসান বললো, 'আমরা কাল দুপুরে মাহমুদের বাসায় যেতে পারি, ওখানে না হয় ছবি নিয়ে কথা বলা যাবে।'

'ও মা, তাই, তাহলে তো ভালোই হয়,' রিয়ানা খুব আনন্দের সাথে সাড়া দিলো; অনেকদিন থেকেই হাসানকে কাছে পেতে চাইছিল, ওর অনেক কথা আছে।



## ৪৬

মাহমুদের দোতলার অতিথি কক্ষের পশ্চিমের জানালার পর্দা খানিকটা সরে গিয়ে সরু একফালি রোদ রিয়ানার উন্মুক্ত মেদহীন পেটের উপর এসে পড়েছে, শাদা চামড়ার উপরে যমুনার চরের মতো আড়াআড়ি শাদাটে দাগ, রাবারকে অনেকখানি টেনে ছেড়ে দিলে কুঞ্চিত রেখা দেখা দেয় অনেকটা তেমনই। হাসান ওখানে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এই দাগগুলো কিসের?' চাদর টেনে পেটের উপর ঢেকে টুনটুনি বললো, 'আমার দুটো বেবি হয়েছে, নরমাল ডেলিভারি, তখন এই দাগ গুলো হয়েছে।'

'দাগগুলো চলে যায় না?'

'জানি না, হয়তো ট্রিটমেন্ট আছে।'

টুনটুনি বাম কাত হয়ে হাসানের রোমশ বুকে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের এই সম্পর্কটিকে কি নাম দিবো? আমি আপনার কে? ফ্রেন্ড? গার্ল ফ্রেন্ড? ফিয়াসে?'

'সময় বলবে,' হাসানের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'আমরা অনেকটা লম্বা পথ পাড়ি দিবো একসাথে, আপনি থাকবেন না আমার সাথে?'

হাসান দু'হাতে টুনটুনির মুখ তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো, 'কি মনে হয় আপনার?' 'এখন সময় নয় কথা বলবার, এখন সময় ভালোবাসবার,' বলে টুনটুনি হাসানের উপরে উঠে এলো।

শ্রান্ত টুনটুনি বালিশে মুখ গুঁজে উপর হয়ে শুয়ে আছে, হাসান ওর শরীরে চাদর টেনে দিয়ে ঘাড়ের নীচে পিঠের মাঝে চুমু দিয়ে ফ্রেশ হতে গেছে; ফিরে এসে দেখে টুনটুনি ওভাবেই শুয়ে আছে, ও আবার পিঠে ঠোঁটের ছোঁয়া দিতে টুনটুনির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। টুনটুনি হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে টেনে বললো, 'উম, এখন না, একটু পরে; আচ্ছা, কাল আমাকে ছবিতে কেমন দেখলেন বললেন না তো!'

হাসান নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আধশোয়া হয়ে বসলো, 'রাগ করবেন না তো?'

'না, আপনি বলেন।'

'ওই চরিত্রে আপনাকে মানায় নি, তাছাড়া দু'মিনিটের ভুমিকায় নিজেকে ফুটিয়ে তোলার কোনো সুযোগ আপনার ছিলো না। আপনার মেয়েরা বড় হয়েছে, শরীফ সরকারি কর্মকর্তা এই সময়ে ওই চরিত্র নিতান্তই বেমানান। স্পষ্ট করে বললে এটি গ্রহণ করা অনুচিত হয়েছে।'

রিয়ানার বিমর্ষ মুখ আর নিভে আসা চোখের আলো দেখে হাসান অনুভব করলো ও সমালোচনাটি সহজ ভাবে নিতে পারে নি। রিয়ানা অস্ফুট স্বরে বললো, 'কেউ ডাকে না, আর যারাই বা ডাকে তারা বিনিময়ে কিছু চায়। আমার নাট্যদলের পরিচিত জ্যেষ্ঠ সহশিল্পীর অনুরোধে চরিত্রটি গ্রহণ করি। আরও কিছু শুটিং হয়েছিল, এডিটিং-এ বাদ পড়েছে।'

হাসান রিয়ানাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললো, 'মন খারাপ করবেন না। আপনি একটু বেছে চরিত্র নিলে আরো ভালো করতে পারবেন। না পেলে সিনেমায় অভিনয় করবেন না, মঞ্চ নাটকে করেন।'

'আচ্ছা, আমি ফ্রেশ হয়ে আসি, আপনার সাথে অন্য বিষয়ে কথা আছে,' রিয়ানা হাসানের ঠোঁটে চুমু দিয়ে উঠে গেলো।

মাহমুদ, হাসানদের জন্য রেড ওয়াইনের একটি বোতল রেখে গেছে; রিয়ানা ফিরে আসার পর হাসান ওয়াইন দুটো গ্লাসে ঢেলে একটি রিয়ানার হাতে দিলো, 'লেট আস ড্রিঙ্ক টু আওয়ার রিলেশনশিপ, চিয়ার্স।'

'চিয়ার্স' ছোট একচুমুক দিয়ে রিয়ানা ওর দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলো, ওর চোখের তারায় আলোর দ্যুতি, 'আপনি আমাকে ছেড়ে কখনো যাবেন না তো?'

'আপনি না বললেন অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে, এখনই যাওয়ার কথা ভাবি কি করে? আপনি কি নিয়ে যেন কথা বলবেন?'



'ও, হ্যাঁ, শরীফ আপনার সাথে কথা বলতে চাইছিল, আপনি বৃহস্পতিবার আমাদের সাথে ডিনার করেন।'

'সেটা করা যাবে। কোন্ বিষয়ে কথা বলবেন?'

'শরীফ ব্যবসার প্রস্তাবনা নিয়ে কথা বলবে, আমি নিজেও কিছু করতে চাই। ঘরে বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না।'

'আহমেদ সাহেবের ব্যাপারটি কি বলেন তো?'

'আজকে থাক, আরেকদিন বলি।'

টুকটাক কথা, হাসি আর দুষ্টুমিতে অনেকটা সময় গড়িয়ে গেলো। বাইরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। হাসান লাইট জালাতে গেলে রিয়ানা হাত বাড়িয়ে বাঁধা দিয়ে বললো, 'থাক, আবার হবে না?'

'কি ক'রে এমন তীক্ষ্ণ বানালে আঁখি
কি ক'রে এমন সাজালে সুতনু শিখা?
যেদিকে ফেরাও সেদিকে পৃথিবী পোড়ে।
সোনার কাঁকন যখন যেখানে রাখো,
সেখানে শিহরে, ঝঙ্কার উঠে সুরে।' —নির্মলেন্দু গুণ

৪৭

দরজায় টোকার আওয়াজে হাসান মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে টুনটুনি দাঁড়িয়ে। 'আহা! কি বিস্ময়কর ব্যাপার! সূর্য কি আজ পশ্চিমে উঠেছে?' হাসানের বিস্ময়ে টুনটুনি আপত্তি তুলে, 'জ্বী না, আমি কি আপনার এখানে আসতে পারি না?'

'অবশ্যই পারেন,' বলে হাসান অপলক দৃষ্টিতে টুনটুনিকে দেখছে; সাদা শিফন শাড়ীতে নীলচে সবুজ আর কালোর ছোঁয়া, কালো কনুই পর্যন্ত লম্বা ব্লাউজ, গলায় হলুদ পাথরের মালা, হাত ভর্তি আইভরি রঙের কৃত্রিম পাথরের চুড়ি, ডান হাতের তর্জনীতে সবুজ আর হলুদ পাথর বসানো বড় আংটি, অনামিকাতেও আরেকটি আংটি, বাম হাতে বড় ডায়ালের ঘড়ি, বাম হাতের মধ্যমায় লাল রুবি পাথরের আংটি, লাল নেইল পলিশ, ঠোঁট দুটো লাল রঙে আঁকা, হালকা লালচে চুল, চোখে বড় ফ্রেমের কালো রোদ চশমা। ওর সৌন্দর্যে বিমোহিত হাসান বাক্যহারা, টুনটুনির মৃদু কাশিতে সম্বিত ফিরে পেলো।

'এত সুন্দর সেজে কোথায় গিয়েছিলেন?' 'কেন আপনার কাছে আসতে পারি না? আসলে এফডিসিতে গিয়েছিলাম। আজ শিল্পী সমিতির নির্বাচন ছিল, ভোট দিয়ে এলাম। ওটা রঙিন জগত, একটু সাজগোজ করে না গেলে পাত্তাই পাবো না।'

'লাঞ্চ করেছেন? চলেন তাহলে কোথাও বসে লাঞ্চ করি?' হাসানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে টুনটুনি বললো, 'করি নি, তবে কষ্ট না হলে, হালকা কিছু এখানেই আনান। আমি এসেছি আজকে আপনাকে নিয়ে ঘুরবো, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

'ও, আপনার মেয়ে চৈতি কেমন আছে? কাল বলছিলেন ওর জ্বর,' হাসান জিজ্ঞেস করলো।

'ভালো আছে এখন, এজন্যই বেরোতে পেরেছি,' টুনটুনি জানালো। 'ও আমার কোল পোছা মেয়ে, অনিন্দিতা হওয়ার প্রায় এগারো বছর পরে চৈতিকে পেটে ধরেছি, বলতে পারেন আল্লাহর কাছে চেয়ে নিয়েছি,' টুনটুনি যোগ করেছে।



'এত বছর পরে হঠাৎ করে কেন?'

ওই সময়ে আমি ভীষণ অস্থির ছিলাম, কাজকর্ম তেমন নেই; শরীফ অনেক দূরে সরে গেছে, সংসারের প্রয়োজন ছাড়া কথা হয় না বললেই চলে। রুবেলের সাথে সম্পর্কটি ছিন্ন হওয়ার পর একাকী জীবন কাটিয়েছি। আমি তো একজন নারী, আমার ঘর আছে, সংসার আছে, স্বামী থেকেও নেই; স্বামী সোহাগ কি কখনো জানি নি। এই শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে অনেকের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে। রুবেল সম্পর্কে আপনি জানেন, এ ছাড়াও আরো কয়েকজন এসেছে আমার জীবনে। ওরা সবাই আমার রূপ সৌন্দর্যকেই দেখেছে, আমার মন দেখে নি। ওরা আমার উচ্ছলতাকে দেখেছে, ভিতরের গভীর নদীটি দেখেনি; ওরা আমার হাসি দেখেছে বুকের হাহাকার আর চোখের জল দেখেনি। এমনকি আমি কোন্ ধর্মের অনুসারী তা জানে না; আমি কি মুসলিম না খৃস্টান তা জানে না। আমি কে? আমি কি? আমি কার? কাকে নিয়ে আমার জীবনযাপন? কেনই বা এই বেঁচে থাকা?

বলতে বলতে টুনটুনির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, ম্লান হয়ে এসেছে মুখ। হাসান টেবিলের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে টুনটুনির হাতে হাত রেখে বললো, 'এখন থাক, পরে বলেন।'

টুনটুনি উঠে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গলফের সবুজ গালিচার দিকে তাকিয়ে থাকলো, অনেকটা সময় কেটে গেলো নীরবতায়। হাসান তার চেয়ার থেকে টুনটুনির পাশ ফেরা মুখ দেখতে পাচ্ছে, বিকালের নরম রোদে উজ্জ্বল, তারপরেও পিছনে অনেক ভিতরে গভীর কালো ছায়া; হতাশা, বেদনা, বঞ্চনা, দুঃখ সবগুলো কালো রঙ যেন একসাথে জমাট বেঁধে আছে। হাসান উঠে গিয়ে প্রগাঢ় মায়ায় টুনটুনিকে আলিঙ্গন করলো, টুনটুনি দু'হাতে হাসানকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মাথা রাখলো।

'সই, কে বলে পিরিতি ভাল?
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
কাঁদিতে কাঁদিতে জনম গেল! —চণ্ডীদাস

টুনটুনি দক্ষ হাতে গাজীপুর চৌরাস্তায় বাস-ট্রাকের জ্যাম এড়িয়ে ময়মনসিংহ অভিমুখী মহাসড়কে উঠে জানতে চাইলো কোন্ দিকে যাবে। হাসান মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে টুনটুনির গাড়ী চালানো দেখছিল, 'সোজা চলেন, রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তায় এসে পশ্চিম দিকে মির্জাপুর যাব। ওখানে আমার বন্ধুর বাংলো আছে, আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছে।'

'আপনি এত নিখুঁত গাড়ী চালানো শিখলেন কিভাবে?'

'আমি তো অনেক দিন থেকে গাড়ী চালাই। অনিন্দিতা যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে তখন ওর স্কুল ডিউটি আর আমার শুটিং দুটো মেলাতে গিয়ে শরীফের কাছে গাড়ী চাইলাম, ও কিনে দিলো। ড্রাইভার আছে, তবে আমি চালাতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করি।'

বাংলোটি মির্জাপুরে বংশী নদীর তীরে, ছিমছাম ছোট বাংলো, লাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল টিনের ছাঁদ, পাকা দেয়াল, দুটো কক্ষ, ডাইনিং, কিচেন, সামনে নদীর দিকে মুখ করে টানা বারান্দা। কেয়ারটেকার দৌড়ে এসে প্রবেশ ফটক খুলে দিলে টুনটুনি পোর্চের নীচে গাড়ী থামিয়ে বেরিয়ে এসে বললো, 'বাহ! ভীষণ সুন্দর তো!'

'আবদুল, এই ব্যাগটি ভিতরে রাখো, আর দুটো চেয়ার ওই কাঁঠাল গাছের নীচে দাও, আমরা বসি। নাস্তা রেডি আছে? ওখানেই নিয়ে এসো।'

'জ্বী, স্যার,' ব্যাগ হাতে নিয়ে ভিতরে যেতে যেতে কালাম জানালো।

বংশী খুব ছোট নদী, যমুনা থেকে উৎপত্তি হয়ে টাঙ্গাইল জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাশিমপুরের কাছে এসে তুরাগের সাথে মিলেছে। গড় অঞ্চলের লাল মাটিতে ওর জল ঘোলাটে, এদিকটায় গভীরতা খুব বেশি নেই। ওপাড়ে ঘন শাল-গজারীর বন, ছোট ছোট সাদা ফুলে ছেয়ে আছে, এপাড়ের বন উজাড় হয়েছে গত তিন দশক



ধরে। ওরা আসার পথে দু'পাশে শিল্পায়নের প্রভাবে ক্ষীণ হয়ে আসা বন লক্ষ্য করেছে।

'এপাড়ে যা দেখছেন, ওই দূরের ইটের ভাটা, ধান ক্ষেত সবই আমার বন্ধুর পৈতৃক সম্পত্তি, মাঝে মাঝে আসে। কেমন লাগছে?'

'খুবই ভালো। বেশ নিরিবিলি, ওপাড়ে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওই জঙ্গলে বন্য পশু নেই?'

'তেমন বড় কিছু নেই। শিয়াল, বাঘদাসা আর বানর আছে। পাখী আছে অনেক। তবে যেভাবে কলকারখানা হচ্ছে, এগুলোও হারিয়ে যাবে।'

'আমার খুব শখ এরকম একটি বাংলো বানাবো, নদীর পাড়ে। শরীফকে বলেছি, ও রাজী হয়েছে, এদিকে জমি দেখছে।'

'আপনি আহমেদ সাহেবের বাংলোতে বেড়াতে গিয়েছেন? আমাকে উনি যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন। সময় করে উঠতে পারছি না, কেমন ওই বাংলো?'

ভ্রূ কুঁচকে টুনটুনি হাসানের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, 'আপনি কি বাংলোর কথাই জানতে চাচ্ছেন না কি আমার সাথে ওনার সম্পর্কের বিষয়টি জানতে চান? আমি জানি না সেদিন আমার বাসায় আপনি কি দেখেছেন, যেটি নিয়ে প্রায় ছয় মাস আমার সাথে কথা বলেন নি। আপনার কাছে আমার লুকোবার কিছু নেই, আমার অতীতের অনেক কিছুই আপনার জানা।'

হাসান অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'না না, আমি দুঃখিত, আপনাকে বিব্রত করবার জন্য জানতে চাই নি।'

'ঠিক আছে, আপনার ও আমার মধ্যে আমি সুতোটি পর্যন্ত রাখি নি, এটি তো আমার জীবনের ঘটে যাওয়া এক অধ্যায় মাত্র, চলেন ভিতরে যাই এখানে রোদ এসে পড়েছে।'

## ৪৯

টুনটুনির কথা:

আহমেদ ভাই আমাদের বাসায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার পর ওনার সাথে আমার কথা হয় নি। মাস দু'এক পর শরীফ জানালো যে, আমরা পঞ্চগড় বেড়াতে যাবো। ওই বৃহস্পতিবার ও আসবে না, আমাকে বললো যেন গাড়ী নিয়ে অনিন্দিতাকে নিয়ে চলে আসি, ও আমাদের সাথে আহমেদ ভাইয়ের বাংলোতে যাবে। আমরা একদিন থেকে শনিবার বিকালে রওনা দিয়ে ঢাকায় ফিরবো। শরীফের রবিবার ঢাকায় হেড অফিসে মিটিং আছে। আমি তো ভীষণ খুশী, আমার বাইরে যেতে পারলে ভালো লাগে।

পঞ্চগড় শহর থেকে শরীফকে তুলে নিয়ে আহমেদ ভাইয়ের বাংলোতে যখন পৌঁছেছি তখন শেষ বিকেল, সূর্য ডুবু ডুবু করছে; বাংলোতে পৌঁছে আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেলো, অসম্ভব সুন্দর, পরিপাটি করে সাজানো, গুছানো, লনের ঘাস ছেঁটে ছোট করে রাখা। অনিন্দিতা গাড়ী থেকে নেমেই ওই সবুজ লনে ছুটাছুটি শুরু করেছে; ঢাকায় তো বলতে গেলে ঘরবন্দী থাকে। শরীফ আমাদের ব্যাগ নামতে ব্যস্ত। আমি আহমেদ ভাইয়ের সাথে ওনার ফলের বাগান ঘুরে দেখলাম। বাগানের পেয়ারা গাছ থেকে একটি ডাসা পেয়ারা পেড়ে নিয়ে কামড় বসিয়েছি, চোখের কোনা দিয়ে দেখি আহমেদ ভাই তাকিয়ে আমার পেয়ারায় কামড় বসানো দেখছে; আমি লজ্জায় লাল হয়ে বললাম, 'সরি, লোভ সামলাতে পারি নি।' 'আনা, কি বলো! খাও তো,' আহমেদ বলে আরো কয়েকটি নিজেই পেড়ে দিলেন।

'আপনি এভাবে তাকিয়ে থাকলে খাওয়া যায়!'

'তোমার খাওয়া দেখতে ভালো লাগছে যে!' আহমেদ ভাইয়ের সরল স্বীকারোক্তি।

'আপনি না! চলেন বারান্দায় বসি, সন্ধ্যা নেমে এসেছে।'



এরমধ্যে শরীফ ব্যাগ রেখে ফিরে এসেছে; আমরা সবাই বারান্দায় বসে আড্ডায় মেতে উঠলাম, ঘন্টা দুয়েক আড্ডা দেওয়ার পর মেয়েকে নিয়ে নিজেদের কক্ষে গেলাম, সারাদিনের জার্নিতে একটু ক্লান্ত হয়েছি, শাওয়ার নিবো। ওরা থেকে গেলো আড্ডায়।

আমার রেডি হতে সময় লাগে সবসময়ই, অনিন্দিতার চোখে ঘুম। কিচেন থেকে খাবার নিয়ে ওকে খাইয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে ওদের মাঝে ফিরে এসেছি। আহমেদ ভাই সবাইকে আগে ডিনারের জন্য আহ্বান করলেন; অনেক আয়োজন করেছেন, নদীর পাবদা, গলদা চিংড়ি, দেশী মুরগী, ভাত, পোলাও সবই; বেশীর ভাগই থেকে গিয়েছে।

ডিনারের পরে সবাই বারান্দায় ফিরে এসেছি, আড্ডা জমে উঠেছে, আহমেদ ভাই বলেন আমরা শুনি। অনেক দিনের ব্যবসা, অনেক গল্প শুনতে ভালো লাগছে। আমার নিজেরও ব্যবসা করার ইচ্ছে ছিল, একবার চেষ্টাও করেছিলাম, সফল হই নি, আপনি জানেন।

ওর সহকারি সামনের টেবিলে ব্ল্যাক লেবেল হুইস্কি, চারটি গ্লাস আর বরফ দিয়ে গেছে। 'আনা, চলবে নাকি?' আহমেদ ভাই জানতে চাইলেন। 'আমি তো হুইস্কি পান করতে পারি না, রেড ওয়াইন হলে হবে,' আমি জানালাম। আহমেদ ভাই বললেন, 'আমি তোমার জন্য রেড ওয়াইন এনে রেখেছি, নিয়ে আসি।'

আহমেদ ভাই ওনার কক্ষ থেকে রেড ওয়াইন-এর বোতল নিয়ে এসে আমাকে ঢেলে দিলেন। আমরা পানীয়ের স্বাদ নিতে নিতে গল্পে মেতে উঠেছি। আহমেদ ভাই দেশে একাই থাকেন, ওনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে লন্ডনে থাকে। বছরে একবার দেশে আসে, উনি বার দুয়েক যান।

'আপনার একা লাগে না। এতো বড় বাংলো, আশপাশে কেউ নেই।'

'অভ্যাস হয়ে গেছে, তাছাড়া প্রায়ই মেহমান আসে, সময় কেটে যায়,' আহমেদ ভাই বললেন।

'কি শরীফ তুমি চুপচাপ, কিছু বলছো না যে?' আহমেদ ভাই জিজ্ঞেস করলেন।

শরীফ দুই পেগের বেশি কখনও পান করে না। আজ চার পেগ এর মধ্যে পান করে ফেলেছে। ওর নেশা ধরে গেছে। শরীফ বললো, 'ভাই, আমি যাই, আর বেশি মনে হয় থাকতে পারবো না।'

'তুমি অনিন্দিতাকে একটু দেখে যেও, আর বারান্দার একটা লাইট রেখে বাকিগুলো নিভিয়ে দাও,' আমি বললাম। আমার যেতে ইচ্ছে করছে না, ভালোই লাগছে গল্প শুনতে, আমিও একটু টিপসি হয়েছি।

আমরা দুজন আলো-আঁধারীতে পাশাপাশি বসে জ্যোৎস্নার আলোয় স্নান করছি আর মাঝে মাঝে দু'একটি কথা হচ্ছে। 'আনা, তুমি তো অভিনয় করো, সিনেমা বেরিয়েছে?' আহমেদ ভাই জানতে চাইলেন। উনি একদম ঠিক জায়গায় টোকা দিয়েছেন। 'অভিনয় আমার প্রেম, আমার দুটো ছবি মুক্তি পেয়েছে আর অনেকগুলো নাটকে অভিনয় করেছি, বেশ কয়েকটি মঞ্চ নাটকেও অংশ নিয়েছি,' আমি বললাম।

'তাই! নাচ-গান করতে হয়?'

'আহমেদ ভাই, কি যে বলেন, নাচ-গান ছাড়া ছবি হয়!'

'তুমি নাচতে পারো?'

আমি কেন যেন নিজেকে ওনার কাছে তুলে ধরতে চাইলাম; 'হ্যাঁ, পারি, দেখবেন? মিউজিক দেন।'

আহমেদ ভাই ওনার মোবাইল থেকে 'লায়লা হু লায়লা' অনেক দিনের পুরোনো একটি গানের রিমিক্স চালিয়ে দিলেন। আমি সোফা ছেড়ে উঠে ওই মিউজিকের সুরে সুরে আমার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে নাচের মুদ্রা ফুটিয়ে তুলছি, অনেকটা ক্যাবারে নর্তকীর মতো। বুঝতে সময় লাগলো না যে আমার দেহবল্লরীর ঢেউ ওনাকে আবেশিত করছে, উনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে নাচে সঙ্গ দিতে থাকলেন, ওনার নাচের মুদ্রাজ্ঞান ভীষণ বাজে, তারপরেও ভালো লাগলো। আমি বললাম, 'এবার একটু স্লো মিউজিক দেন আমরা একসাথে নাচবো।' আমি ওনার



বাঁ হাত আমার ডান হাতে নিয়ে ওনার ডান হাত আমার কোমরের কাছে রাখলাম। উনি একটু ইতস্তত করছিলেন। আমি বললাম, 'আহমেদ ভাই, নাচতে হলে একটু কাছকাছি হতেই হয়, আমি কিছু মনে করছি না।' আমি মনে মনে চাইছি ওনাকে কাছে চাইছি। শরীর জেগে উঠছে, শিরায় শিরায় বান ডেকেছে। আমরা ওই মিউজিকের তালে তালে ধীর লয়ে নাচতে থাকলাম, অনেকক্ষণ; দুজনের মাঝে দূরত্ব নেই, আমার নরম স্তন চেপে বসেছে ওনার বুকের মাঝে, আমি ওনার কাঁধে মাথা রেখে ওনাকে অনুভব করছি, অনুভব করছি ওনার পুরুষত্ব।

'আনা, আমার মনে হয় তুমি এখন ঘুমাতে যাও,' আহমেদ ভাই আমার কানের কাছে বললেন।

'আপনি যাবেন না?'

'যাব, তোমাকে কক্ষে পৌঁছে দেই, তুমি হেঁটে যেতে পারবে না।'

উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার কক্ষের দরজা পর্যন্ত গেলেন। আমি ওনাকে না ছেড়ে মদিরাসিক্ত কণ্ঠে বললাম, 'আমার সাথে থাকেন না, শরীফ তো ওই কক্ষে ঘুমিয়ে গেছে।'

'আজ না, তুমি এখন নিজের মধ্যে নেই,' আহমেদ ভাই আমাকে বিছানায় শুইয়ে কপালে ঠোঁট ছুঁয়ে দরজা টেনে চলে গেলেন। অনিন্দিতা ঘুমিয়ে আছে। আমি ওর পাশে জেগে থাকলাম আহমেদ ভাই চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ। মনে মনে ভাবছি, আহমেদ ভাই কেন প্রত্যাখান করলেন? আমি তো উন্মুখ হয়ে ওনার সামনে নিজেকে তুলে ধরেছি। নিজের চাওয়া কি বেশি তুলে ধরেছি? নিজের আদেখলেপনায় লজ্জা লাগছে। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে গেছি টের পাই নি। পরের দিন অনেক বেলা করে ঘুম থেকে উঠেছি।

৫০

'মা, দেখো কাঠবিড়ালি!' অনিন্দিতা ছুটে ওদের ধরার চেষ্টা করছে, কাঠবিড়ালি ফুড়ুৎ করে গাছের মগডালে উঠে গেছে। আমরা সকালের নাস্তা সেরে আহমেদ ভাইয়ের চা বাগানে ঘুরছি, কোমর সমান উঁচু চা গাছে নতুন পাতা এসেছে। চা বাগানের মালীরা পরিচর্যায় ব্যস্ত। করতোয়া নদীর পাড়ে পৌঁছে আমি বিমুগ্ধ, স্রোত নেই, সাদা বালুর চর, বাগানের ব্যাপ্তি নদীর পাড় অবধি। আমি অনিন্দিতাকে নিয়ে সোজা নদীর কিনারায় নেমে গিয়েছি, মা-মেয়ে পা ডুবিয়ে হাঁটছি; আগের রাতের রক্তের উষ্ণতা নদীর জলে শীতল হয়ে এলো।

বাংলোতে ফেরার পথে শরীফ জানালো যে, দুপুরের পরে বাংলাবন্ধ যেতে চায়, জিরো পয়েন্টে। আমাকে বাংলো আর তার চারপাশ এতো মোহিত করেছে যে আমি এটা ছেড়ে যেতে চাইলাম না। 'তুমি, অনিন্দিতাকে নিয়ে যাও, আমি এখানেই ঘুরবো,' আমি ওকে জানালাম।

দুপুরে খাওয়ার পর শরীফ অনিন্দিতাকে নিয়ে চলে গেলো, ওদের ফিরতে সন্ধ্যা হবে। ওদের বিদায় দিয়ে আমি আর আহমেদ ভাই বারান্দায় বসে গল্প করছি। গল্পের ফাঁকে আহমেদ ভাই স্বীকার করলেন যে মাঝে মাঝে একা লাগে। 'কি করেন তখন,' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এই তো, এরকম বসে থাকি, সন্ধ্যা হলে এক'দু পেগ খাই, এভাবেই সময় কেটে যায়।'

ওনার কণ্ঠস্বরে একাকীত্বের বেদনা ফুটে উঠেছে, আমি ওনার হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বললাম, 'আমি আছি, আপনার যখন একা লাগবে আমার সাথে কথা বলবেন।'

উনি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার সামনের সবুজ লনের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। বেশ কিছু সময় এভাবেই দু'জনে পাশাপাশি বসে থেকেছি। আমি চোখ বন্ধ করে ওনার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে ভর দুপুরের নিস্তব্ধতা উপভোগ করছি। খানিক পরে টের পেলাম উনি ওনার মুখ নামিয়ে এনেছেন আমার মুখের উপর, ওনার



ঠোঁট খুঁজে নিয়েছে আমার ঠোঁট, বাঁধা দিলাম না, চোখ বন্ধ করেই সাড়া দিলাম। ওনার হাত নেমে এসেছে আমার কোমরে, একটু একটু করে খুঁজে নিচ্ছে তার ঠিকানা। আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, 'ভিতরে চলুন।'

ওই থেকে আমাদের মাঝে সম্পর্কটি শুরু হলো, ওনার ঢাকার উত্তরায় অ্যাপার্টমেন্ট ছিল, উনি ঢাকায় গেলেই আমি ওখানেই চলে যেতাম। আমাদের মাঝে সম্পর্কটি মানসিকের চাইতে শারীরিকই ছিলো বেশি। কেন যেন মনের মাঝে কোন বন্ধন সৃষ্টি হলো না, হয়তো বা দুজনের বয়সের অনেক দূরত্ব তাই। উনি আমাকে বেশ প্রশ্রয় দিতেন। আমি যা চেয়েছি ওনার কাছে চেয়ে নিয়েছি। যখন শরীফ পঞ্চগড় থেকে কুমিল্লা বদলী হয়ে গেলো, তখন কখনো কখনো আমি একা এখানে চলে এসেছি, দু'দিন থেকে আবার ফিরে গেছি। শরীফ জেনেছে কিন্তু কখনো বাঁধা দেয় নি।

'আপনার এই সম্পর্কটি টিকলো না কেন?' হাসান জিজ্ঞেস করলো।

"উনি আমাকে স্নেহ করেন হয়তো ভালোও বাসেন, কিন্তু কখনো নিজের করে পেতে চান নি। আমি বুঝতে চেয়েছি আমাদের মাঝে সম্পর্কের গভীরতা, এর পরিণতি কি হতে পারে। টের পেলাম এটি একটি সমান্তরাল সম্পর্ক, এর পরিণতি নেই। আহমেদ ভাই আমাকে কখনো নিজের করে নিবেন না, আবার আমাকে ছেড়েও যাবেন না। আমাদের দুজনের বন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হতে শুরু করলো, এখনও আমরা পরিবেশ সৃষ্টি হলে মিলিত হই, কিন্তু আগের মতো নয়। ইংরেজীতে বলে না, 'It's an open relationship'। আমি ওনার হৃদয়ের মাঝে জায়গা করে নিতে পারি নি, বা হয়তো উনি সেই জায়গা দিতে চান নি। এভাবেই চলছে, এখনো।"

'আপনি রক্তকরবীর নন্দিনীর মতো কত দিন রঞ্জনের অপেক্ষায় থাকবেন?' হাসান জানতে চাইলো।

টুনটুনি হাসানের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললো, 'রঞ্জন যে আমার ভালোবাসা। ওকে এখনো পাই নি। যারা এসেছে সবাই নিজের মতো করে আমাকে চেয়েছে, নন্দিনীকে কেউ খুঁজে নি।'

হাসান বললো, 'রবি ঠাকুরের একটি কবিতা আছে, শুনবেন?' টুনটুনি মাথা দুলিয়ে সায় দিলো। হাসান তাঁর ভরাট কণ্ঠে আবৃত্তি করছে,

'কাছে আছে দেখিতে না পাও
তুমি কাহার সন্ধানে যাও।
মনের মত কারে খুঁজে মরো।
সে কি আছে ভুবনে
সে রয়েছে মনে।
ওগো মনের মত সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার মুখোপানে চাও।
তোমার আপনার যে জন দেখিলে না তারে
তুমি যাবে কার দ্বারে।
যারে চাবে তারে কাছে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও।'